রবিনসন ক্রুসো

বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা—৩

রবিনসন ক্রুশো

ডেনিয়েল ডিফো

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ

অশোক গুহ

এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
৬।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ডেনিয়েল ডিফো (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ—১৭৩১)

ফো তাঁর আসল নাম। সেই নাম বদলে রাখলেন ডিফো। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক পুস্তিকার লেখক। রাজনীতির বই লিখতে গিয়ে একবার জীবনও বিপন্ন হয়েছিল। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে রবিনসন ক্রুশোর দুঃসাহসিক অভিযান ইংরেজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

॥ এক ॥

ক্রুশো তার কথা শুরু করলে—

হাল-এ আমার বাড়ি। বাবা আমার ছিলেন ব্যবসায়ী। আমি তাঁর সেজ ছেলে। আমার বড় দু'ভাই। এক ভাই যুদ্ধে মারা যায়; আর একজন নিখোঁজ। তাই আমাকে কেউ কিছু বলত না। আমিও কিছুই শিখি নি। আমার মাথায় ছিল কত উদ্ভট ভাবনা। ভাবতাম, অজানা দেশে পাড়ি দেব, কত নতুন জিনিস দেখব।

বাবাকে একথা বলায় তিনি তো রাজী হলেনই না, বরং আমাকে অনেক বোঝালেন। মাকে গিয়ে ধরলাম, কিন্তু বাবার মত বদলাল না। তিনি বললেন, ও বাড়িতে থাকলেই আমি সুখী হব। বিদেশে গেলে ও হতভাগা তো একেবারে গোল্লায় যাবে। না, বিদেশে যাওয়া ওর হবে না।

কি আর করব, চুপ করে বাড়িতে বসে রইলাম। কিন্তু মন যে মানে না। আমার এক বন্ধু এসে একদিন খবর দিলে, তাদের একখানা ছোটখাটো জাহাজ আছে, সেই জাহাজে সে যাবে হাল থেকে লণ্ডনে। আমি ইচ্ছে করলে তার সাথী হতে পারি।

আমি তো অমনি রাজী। বাবা-মাকে কোন কথা না বলে জাহাজে উঠে পড়লাম। দিনটা স্পষ্ট মনে আছে—পয়লা সেপ্টেম্বর।

জাহাজ তো বন্দর ছেড়ে লণ্ডনের পথে রওনা হল, এবার জোর বাতাস বইতে লাগল, ঢেউ পাহাড়-সমান উঁচু হয়ে ছুটে এল। এর আগে তো কখনো সমুদ্রে ভাসি নি, তাই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আর মনে হল, বাবা-মার মনে দুঃখ দিয়ে পালিয়ে এসেছি—তাই বুঝি ঈশ্বর আমাকে এবার জবর শাস্তি দেবেন।

এদিকে ঝড় বেড়ে চলেছে, জাহাজ তো টলমল করছে। এমনি করে রাতটা কাটল। সকাল হতেই দেখি—সমুদ্র শান্ত—পাটীর মতো বিছিয়ে আছে।

যাহোক, নিশ্চিন্ত হলাম।

ক'দিন ভালয় ভালয় কাটল। জাহাজ ভেসে চলেছে। নীল সাগর—দূরে আবছা বন্দরের সার। লণ্ডন আর বেশি দূরে নয়।

এমন সময় আবার ঝড় উঠল। আবার সেই পাহাড়-সমান ঢেউ, আবার সেই দোলা। সন্ধ্যা হতে আরও জোরালো হয়ে উঠল হাওয়া। আমাদের জাহাজের কাপ্তেন বললে, আর উপায় নেই, মাস্তুল ক'টা কেটে দাও।

আমরা সবাই ভয়ে অস্থির।

এমন সময় আর এক কাণ্ড। জাহাজের তলা ফেঁসে গেল, জলে ভরে গেল জাহাজ। আমি তো সব দেখেশুনে মূর্ছা গেলাম। কিন্তু তখন সবাই ব্যস্ত, কে কার দিকে তাকায়, খানিকক্ষণ পরে আমি নিজেই জ্ঞান ফিরে পেলাম।

দূরে একখানা জাহাজ যাচ্ছিল। আমাদের দুর্দশা দেখতে পেয়ে জাহাজ থেকে নৌকো পাঠিয়ে দিলে। কোন মতে রক্ষা পেলাম।

ইয়ারমাউথে এসে আমরা পৌঁছুলাম।

বাড়ি ফিরে গেলে বাবা-মা খুশিই হতেন, গ্র্যাণ্ড ফিস্টি দিতেন। কিন্তু আমি বাড়ি ফিরতে নারাজ।

ইয়ারমাউথে আমার বন্ধুটির বাবা থাকতেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন, শোন হে ছোকরা, আমার ছেলের মুখে সবই শুনলাম। তোমার মতো ভীরুর সমুদ্রযাত্রা সাজে না। আর কখনো সমুদ্রে যাবে না। তুমি অলক্ষুণে, তোমার জন্যই মালপত্র-ভরতি জাহাজ ডুবল! আর জাহাজ চাপার নামটি করো না—তোমার সর্বনাশ হবে।

আমি আর কি করব, চলে এলাম।

এর মধ্যে বিয়ে-থা করেছেন ডিফো, তিনটি মেয়েও হয়েছে। বাড়িও তৈরি করেছেন ইংলণ্ডের এক নিরালা কোণে। সেখানে বসে শুধু লিখবেন এই তাঁর সাধ। তাই সরকারী চাকরি ছেড়ে দিলেন, কাগজখানাও বন্ধ হয়ে গেল। স্টোক নিউয়িংটনের নিরালা নির্জনে বসে বসে ভাবেন ডিফো। রাজনীতি আর ধর্ম নিয়ে তো বই লিখেছেন, সেগুলো গরম গরম লোকের খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু দু'দিনেই মানুষ ভুলে গেছে। এবার তেমনি লেখা লিখলে চলবে না। লিখতে হবে উপন্যাস, লিখতে হবে অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী, ইতিহাস। এই বইগুলোই তাঁর নাম বাঁচিয়ে রাখবে।

ভাবতে বসলেন ডিফো। মনে পড়ল—ব্রিস্টল শহরের রেড লায়ন সরাইখানার কথা। আলো জ্বলছিল ঘরে। এখানে-ওখানে মানুষ বসে খাচ্ছে। ডিফোও এক কোণে বসেছিলেন। এমন সময় এল এক নাবিক। নাবিকের নীল পোশাক পরনে। সে এসে সোজা বসল তাঁর টেবিলে। দাড়ি-গোঁফে ঢাকা তার মুখ।

ডিফো তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এ যেন চেনা মুখ, কিন্তু চিনতে পারছেন না।

নাবিক হেসে বললে, আমাকে চেনেন নাকি ?

মনে হয় যেন চিনি, কিন্তু ঠিক চিনতে তো পারছিনে !

আমার নাম আলেকজান্দার সেলকার্ক।

তুমি সেলকার্ক !—ডিফো চেঁচিয়ে উঠলেন।

হাঁ, আমিই সেই। আমার কথা তো অনেকেই লিখেছেন, স্টীল মস্ত লেখক, তিনিও লিখেছেন।

আমিও লিখব।—ডিফো বলে উঠলেন। তোমাকে আমি অমর করে রাখব। বল—তোমার গল্প বল আমাকে।

সেলকার্ক হাসলে, স্টীল লিখেছেন, কাগজে বেরিয়েছে—আবার কি চাই ! কে একজন লেখক—সে আবার নতুন কি লিখবে !

ডিফো তার মনের কথা বুঝলেন। তবু বললেন, তুমি বুঝবে না

আমি তোমাকে এমন রূপ দেব, যা মানুষ ভুলতে পারবে না। তুমি বল তোমার কাহিনী।

সেলকার্ক কি আর করবে, তার গল্প বললে।

ডিফোর আজ মনে পড়ল সেই গল্প। সেলকার্ক বলতে চায় নি, সে কথাও মনে পড়ল। তিনি ভাবলেন, ঐ গল্পই আমি লিখব, কিন্তু এমন ভাবে লিখব—যাতে কেউ বুঝবে না—এ সেলকার্কের কাহিনী। আমি কোথাও তার নাম করব না। তার নাম তো বদলে দেব, সে যে দ্বীপে হারিয়ে গিয়েছিল, তার নামও পাল্‌টে দেব। আর সেলকার্ক তো জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে ঝগড়া করে দ্বীপে তাকে নামিয়ে দিতে বলেছিল, কিন্তু আমার নায়ক তো তা করবে না। সব পাল্‌টে দেব, নাম-ধাম সব। দেখি অমর হয় কিনা এ কাহিনী! দেখি সেলকার্ক বাঁচে, না আমার এই কল্পনার নায়ক বাঁচে!

আচ্ছা, নায়কের কি নাম হবে?

নাম চাই সুন্দর। ওর নাম হোক রবিন্‌সন্ ক্রুশো। রবিন্‌সন্ ক্রুশোর অ্যাডভেঞ্চার লেখা হল। ডিফো তাতে একটু ভূমিকা জুড়ে দিলেন। তাতে বললেন—

এটি প্রকৃত কাহিনী—এতে গল্প একটুকুও নেই।

রবিন্‌সন্ ক্রুশো বেরুল। আর বেরুতেই হৈ-চৈ পড়ে গেল। চার মাসে চারটি সংস্করণ হল। আর লেখক তার দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে শুরু করে দিলেন। সে বইও বেরিয়ে গেল। তারপরে ডিফো লিখলেন উপন্যাস, ইতিহাস, কিন্তু রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মতো অমন হৈ-চৈ আর পড়ল না।

ডিফো হলেন রবিন্‌সন্ ক্রুশোর লেখক। আজও তাই আছেন। তাঁর আর সব বইয়ের কথা মানুষ প্রায় ভুলতে বসেছে। কিন্তু রবিন্‌সন্ ক্রুশো আজও অমর হয়ে আছে, যতদিন পৃথিবী থাকবে, সে-নাম অমর হয়ে থাকবে।

কিন্তু বাড়ি তো ফেরা চলে না।

বাড়ির সবাই মুখ গম্ভীর করে থাকবে, পাড়ার সবাই হাসবে।

পকেটে তখন কিছু রেস্ত আছে, তাই নিয়ে এলাম লণ্ডনে।

সঙ্গী জুটল। আমোদ-প্রমোদে দিন কেটে যেতে লাগল। এরই মধ্যে এক জাহাজের কাপ্তেনের সঙ্গে হল আলাপ। বহু ঘুরেছে লোকটা। এবার আবার যাচ্ছে দূরে। আমাকে তার ভাল লাগল। সে বললে—

...ভাই, তুমি ইচ্ছে করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পার। এক পয়সা খরচ নেই। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে—খাবে-দাবে, আর যদি কিছু মালপত্র সঙ্গে নিতে চাও, তাও নেবে, বেচে দু'পয়সা লাভ করবে।

আমি তো তখুনি রাজী হয়ে গেলাম। কিছু মালপত্র কিনলাম, আর তাই নিয়ে জাহাজে চেপে বসলাম। জাহাজ ছুটে চলল গিনির উপকূলে। সে-বার দু'পয়সা লাভ করেই ফিরলাম।

এখন আমি ব্যবসায়ী। আমার বন্ধু কাপ্তেনটি এরই মধ্যে মারা গেল। আমি আবার সেই জাহাজেই চললাম। কিন্তু এবার পঙ্গপালের মতো দুর্ভাগ্য ঘিরে এল।

ক্যানারী দ্বীপের দিকে জাহাজ চলছিল। এমন সময় ভোরবেলা একদল বোম্বেটে আমাদের জাহাজের দিকে ছুটে এল। আমরাও জাহাজের পাল তুলে দিয়ে ছুটতে লাগলাম। কিন্তু বোম্বেটে জাহাজের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। তাই আমরা এবার লড়বার জন্য তৈরি হলাম। আমাদের জাহাজে তখন ছিল এক ডজন তোপ আর বন্দুক। বোম্বেটেরা কাছে আসতেই বন্দুকগুলো গর্জে উঠল। এবার বোম্বেটে জাহাজ ঘুরে গিয়ে উল্‌টো দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করলে। আর হুড়মুড় করে জন পঞ্চাশ-ষাট বোম্বেটে উঠে এল জাহাজে। আমরা গুলীর পর গুলী চালালাম, কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের তিনজন লোক গুলীতে লুটিয়ে পড়ল, আটজন জখম হল। কি

আর করব, আমরা সাদা নিশান তুলে ধরলাম। ওরা আমাদের বন্দী করলে। আর সবাইকে ওরা কোথায় চালান করে দিলে কে জানে, কিন্তু সর্দার আমাকে তার বিনে মাইনের চাকর করে কাছে রাখলে।

হায়রে ভাগ্য, ছিলাম ব্যবসায়ী, হলাম দাস।

বাবার কথা মনে পড়ল, বন্ধুর বাবার নিষেধও মনে হল। আর উপায় কি! এখন তো ঈশ্বরই ভরসা।

সর্দার আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল। একটা ক্ষীণ আশা তখনো মনে আছে, সে যখন লুট-তরাজ করতে সমুদ্রে যাবে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। তার পরে কোন যুদ্ধজাহাজের হাতে সর্দার ধরা পড়লে, আমারও একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কিন্তু সে আশা আর রইল না। সর্দার আবার চলে গেল—আমি বাড়ি আর তার বাগানের কাজ করতে লাগলাম।

পালাবার ফন্দি আঁটা চলতে লাগল মনে মনে, কিন্তু পালাবার কোনো উপায়ই নেই। এমনি করে পুরো দুটি বছর কাটল।

দু'বছর পরে আবার সুযোগ এল। সর্দার সে-বার বহুদিন বাড়ি বসে ছিল। সে আমাকে আর মারেস্কো বলে একটা ছোকরাকে নিয়ে নৌকো করে মাছ ধরতে যেত। আমি তো মাছ ধরায় ওস্তাদ হয়ে উঠলাম, তাই সর্দার নিজে যেতে না পারলে আমাকে মারেস্কোকে দিয়ে মাছ ধরতে পাঠাত।

একদিন এমনি মাছ ধরতে গেছি। হঠাৎ সাগরে কুয়াশা দেখা দিলে। আর সেই কুয়াশায় আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম। সারাদিন ধরে নৌকো বাইতে লাগলাম, কিন্তু তীর আর দেখা যায় না। চারিদিকে শুধু জল আর জল। শেষে যাহোক কোনমতে পাড়ে এসে উঠলাম।

সর্দার এবার মিস্ত্রী দিয়ে নৌকোয় একটা কেবিন তৈরি করিয়ে নিলে, আর সেই কেবিনে রইল কম্পাস প্রভৃতি জাহাজ চালাবার যন্ত্র।

সেখানে সর্দারের থাকার জন্য বিছানাপত্র রাখা হল, খাবার টেবিলও পাতা হল, একেবারে টিপটপ সাজানো-গোছানো কামরা।

একদিন সর্দার দূর সমুদ্রে যাবে মাছ ধরতে। সঙ্গে যাবে বন্ধুরা। আমি তার হুকুমে সব তোড়জোড় করে রাখলাম। খাবার আনা হল প্রচুর, আর খাবার জলে পিপের পর পিপে ভরতি হল।

ভোর হতেই রওনা হতে হবে, তাই যোগাড়-যন্তর সেরে আমি আর মারেস্কো নৌকোতেই রইলাম। ভোরবেলা সর্দার একা এল, এসে বললে, বন্ধুরা কেউ যাবে না। সকলেরই নানা কাজ পড়েছে। আজ আমিও যাব না। তোরা যা। ক'টা মাছ পেলেই চলে আসবি।

আমার মন তো আহ্লাদে আটখানা। এবার আমি মুক্তি পাব। নৌকো আছে, আছে প্রচুর রসদ আর জল—আর কি চাই। এই নৌকোই আমাকে মুক্তি দেবে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রযাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিলাম।

ছোকরাকে বললাম, যা কিছু খাবার নিয়ে আয়। বড় এক টিন বিস্‌কুট আনবি। মনিবের ওসব খাবারের ভাগ তো আমরা পাব না।

সে চলে যেতে আমি এক তাল মোম, কিছু পলতে নিয়ে এলাম। একখানা কুড়ুল এনেও রাখলাম, একখানা করাত আর একটা হাতুড়িও যোগাড় করা হল।

ছোকরা বিস্‌কুটের বাক্স নিয়ে ফিরে আসতে বললাম, মারেস্কো, কর্তার বন্দুকগুলো তো নৌকোয় এনেছিস, এবার কিছু বারুদ নিয়ে আয়। দু-একটা জল-মোরগ মারা যাবে।

ছোকরা একটা চামড়ার থলে-ভরতি বারুদ নিয়ে এল। আবার কয়েকটা গুলীও আনলে। অমনি করে তৈরি হয়ে নেওয়া গেল। এবার শুরু হল যাত্রা।

বন্দরের মুখে পাহারাদার ছিল, তারা আমাদের চিনত। তাই কিছু বললে না। আমাদের নৌকোখানি ভেসে চলল।

এমন সময় উত্তুরে হাওয়া বইতে লাগল। আমি চাই দক্ষিণে হাওয়া। সে হাওয়ায় পাল তুলে আমরা পৌঁছে যাব কোন বন্দরে। কিন্তু এ কি হল! যাহোক, দমে গেলাম না। হাওয়া যেদিকে বয় বয়ে যাক, আমাকে মুক্তি পেতেই হবে।

ছোকরাকে বললাম, আজ দূরে যেতে হবে। ঢের মাছ চাই।

ও অমনি পাল তুলে দিলে। নৌকো তর্‌তর্ করে ভেসে চলল দূর সাগরে।

ও আপন মনে দাঁড় ধরে বসে আছে, এমন সময় আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ও ছিটকে গিয়ে পড়ল সাগরে।

ও তলিয়ে গিয়েই ভেসে উঠল, আমাকে বললে, সাহেব, আমাকে বাঁচাও!

আমি অমনি কামরা থেকে বন্দুক নিয়ে এসে উঁচিয়ে ধরে বললাম, তুই নৌকোর পেছনে আসিস নে! ফিরে যা। না গেলে গুলী চালাব।

ও আর কি করবে, সাঁতরাতে সাঁতরাতে ফিরে চলল।

তার পরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চললাম। কোথাও কূল নেই। চারিদিকে শুধু থইথই করছে জল। অকূল সমুদ্রে এবার কূল দেখা দিল। কিন্তু সেখানে হিংস্র শ্বাপদের গর্জন সবসময়ে কানে ভেসে আসে।

ক'দিন এই ভাবেই চলল। একদিন ভোরে একখানা জাহাজ দেখতে পেলাম। কামরা থেকে একখানা নিশান এনে উড়িয়ে দিলাম। ওরা দেখতে পেয়ে আমাকে তুলে নিলে।

ওরা প্রথমে পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলে—আমি কে।

তারপরে স্পানিস আর ফরাসী ভাষায়, কিন্তু উত্তর দেব কি, ভাষাই বুঝিনে ছাই। শেষে একজন ইংরেজ পেয়ে সব কথাই বললাম। এমনি করেই উদ্ধার পেলাম।

ইংরেজটি ভারি দয়ালু। সে আমার নৌকোখানা বিক্রি করবার

বন্দোবস্ত করে দিলে। আমার হাতে কিছু টাকাও এল। সেই টাকায় মালপত্র কিনে বন্দরে বন্দরে বেচে দেশে যখন ফিরলাম, তখন আমার হাতে বেশ কিছু জমেছে।

ক'দিন বেশ সুখেই কাটল। কয়েকজন বণিক বন্ধু একদিন এসে বললেন, তাঁরা গায়নায় যাচ্ছেন। আমি তো ওদিকটা চিনি। আমি যদি তাঁদের সঙ্গে যাই তো ভাল হয়।

আমি একটুও না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কথায় রাজী হলাম। আর ১৬৫৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর আবার এসে জাহাজে উঠলাম। প্রথম বার পয়লা তারিখেই বেরিয়েছিলাম, তার পরে তো জাহাজ-ডুবি হয়। এবারে কি হবে কে জানে।

জাহাজখানা আমাদের বেশ বড়সড়ো, একশো বিশ টন মাল বইতে পারে, ছ'টা তোপ আছে। চৌদ্দজন মানুষ। সঙ্গে আফ্রিকার মানুষদের কাছে বিক্রিয় জন্য পুঁতির মালা, কড়ি আর টুকিটাকি জিনিস—যেমন আয়না, ছুরি, কাঁচি, কুড়ুল।

যাত্রা এবার শুভই বলতে হবে। জাহাজ নির্বিঘ্নে ভেসে চলল। কিন্তু সাগরেব মর্জি বোঝা ভার। দেখতে দেখতে একদিন বেঁকে বসল। ঝড় শুরু হয়ে গেল। আমাদের জাহাজ কোন্ দিকে ছুটে চলল, তা বুঝতেই পারলাম না।

ঝড় তখনো বইছে। একদিন আমাদের জাহাজের একজন লস্কর চেঁচিয়ে উঠল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

আমরা অমনি কেবিন থেকে সবাই বেরিয়ে এলাম। আ[illegible] বেরিয়ে আসতে না আসতেই আর এক কাণ্ড। বালির চড়া[illegible] এসে ধাক্কা খেল জাহাজ আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র যেন তার উপর ভে[illegible] পড়ল। আমাদের দশা একবার ভাব ত! জাহাজে জল উঠছে[illegible] ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, এদিকে জাহাজের লাইফ-বোটগুলো প[illegible] ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গেছে। ভাবনারও তখন আমাদের স[illegible] নেই, যে কোন মুহূর্তে জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পা[illegible]

এমন সময় উত্তুরে হাওয়া বইতে লাগল। আমি চাই দক্ষিণে হাওয়া। সে হাওয়ায় পাল তুলে আমরা পৌঁছে যাব কোন বন্দরে। কিন্তু এ কি হল! যাহোক, দমে গেলাম না। হাওয়া যেদিকে বয় বয়ে যাক, আমাকে মুক্তি পেতেই হবে।

ছোকরাকে বললাম, আজ দূরে যেতে হবে। ঢের মাছ চাই।

ও অমনি পাল তুলে দিলে। নৌকো তর্‌তর্ করে ভেসে চলল দূর সাগরে।

ও আপন মনে দাঁড় ধরে বসে আছে, এমন সময় আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ও ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল সাগরে।

ও তলিয়ে গিয়েই ভেসে উঠল, আমাকে বললে, সাহেব, আমাকে বাঁচাও!

আমি অমনি কামরা থেকে বন্দুক নিয়ে এসে উঁচিয়ে ধরে বললাম, তুই নৌকোর পেছনে আসিস নে! ফিরে যা। না গেলে গুলী চালাব।

ও আর কি করবে, সাঁতরাতে সাঁতরাতে ফিরে চলল।

তার পরে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে চললাম। কোথাও কূল নেই। চারিদিকে শুধু থইথই করছে জল। অকূল সমুদ্রে এবার কূল দেখা দিল। কিন্তু সেখানে হিংস্র শ্বাপদের গর্জন সবসময়ে কানে ভেসে আসে।

ক'দিন এই ভাবেই চলল। একদিন ভোরে একখানা জাহাজ দেখতে পেলাম। কামরা থেকে একখানা নিশান এনে উড়িয়ে দিলাম। ওরা দেখতে পেয়ে আমাকে তুলে নিলে।

ওরা প্রথমে পর্তুগীজ ভাষায় জিজ্ঞেস করলে—আমি কে।

তারপরে স্পানিস আর ফরাসী ভাষায়, কিন্তু উত্তর দেব কি, ভাষাই বুঝিনে ছাই। শেষে একজন ইংরেজ পেয়ে সব কথাই বললাম। এমনি করেই উদ্ধার পেলাম।

ইংরেজটি ভারি দয়ালু। সে আমার নৌকোখানা বিক্রি করবার

বন্দোবস্ত করে দিলে। আমার হাতে কিছু টাকাও এল। সেই টাকায় মালপত্র কিনে বন্দরে বন্দরে বেচে দেশে যখন ফিরলাম, তখন আমার হাতে বেশ কিছু জমেছে।

ক'দিন বেশ সুখেই কাটল। কয়েকজন বণিক বন্ধু একদিন এসে বললেন, তাঁরা গায়নায় যাচ্ছেন। আমি তো ওদিকটা চিনি। আমি যদি তাঁদের সঙ্গে যাই তো ভাল হয়।

আমি একটুও না ভেবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কথায় রাজী হলাম। আর ১৬৫৯ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর আবার এসে জাহাজে উঠলাম। প্রথম বার পয়লা তারিখেই বেরিয়েছিলাম, তার পরে তো জাহাজ-ডুবি হয়। এবারে কি হবে কে জানে।

জাহাজখানা আমাদের বেশ বড়সড়ো, একশো বিশ টন মাল বইতে পারে, ছ'টা তোপ আছে। চৌদ্দজন মানুষ। সঙ্গে আফ্রিকার মানুষদের কাছে বিক্রিয় জন্য পুঁতির মালা, কড়ি আর টুকিটাকি জিনিস—যেমন আয়না, ছুরি, কাঁচি, কুড়ুল।

যাত্রা এবার শুভই বলতে হবে। জাহাজ নির্বিঘ্নে ভেসে চলল। কিন্তু সাগরেব মর্জি বোঝা ভার। দেখতে দেখতে একদিন বেঁকে বসল। ঝড় শুরু হয়ে গেল। আমাদের জাহাজ কোন্ দিকে ছুটে চলল, তা বুঝতেই পারলাম না।

ঝড় তখনো বইছে। একদিন আমাদের জাহাজের একজন লস্কর চেঁচিয়ে উঠল—ডাঙা—ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

আমরা অমনি কেবিন থেকে সবাই বেরিয়ে এলাম। আর বেরিয়ে আসতে না আসতেই আর এক কাণ্ড। বালির চড়ায় এসে ধাক্কা খেল জাহাজ আর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র যেন তার উপর ভেঙে পড়ল। আমাদের দশা একবার ভাব ত! জাহাজে জল উঠছে। ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, এদিকে জাহাজের লাইফ-বোটগুলো পর্যন্ত ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গেছে। ভাবনারও তখন আমাদের সময় নেই, যে কোন মুহূর্তে জাহাজ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

এমন সময় মড়মড় শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দ। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—জাহাজ ভেঙে যাচ্ছে! গেল!

ওদিকে উত্তাল সমুদ্র, সেখানে প্রচণ্ড ঢেউ, এদিকে ভাঙা জাহাজ। একখানা মাত্র নৌকো তখনো আছে। আমরা সবাই সেই নৌকোয় উঠে বসলাম। এগারো জন আমরা। সেই উথলে-ওঠা সমুদ্রে আমরা পাড়ি দিলাম তীরের দিকে। তীরে পৌঁছুতে পারব কিনা জানি না। ঈশ্বরকে ডাকছি প্রাণপণে।

তীর বালুময় না পাথুরে কে জানে! শুধু এক আশা, যদি কোন নদী পাই। সেখানে গিয়ে মোহানায় ভিড়বে নৌকো। আমরা দ্বীপে উঠতে পারব। আর তা যদি না পাই, নৌকো গিয়ে আছড়ে পড়বে তীরে—নৌকো চুরমার হয়ে যাবে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে অক্কা পাব।

আমরা নৌকো বেয়ে চলেছি, এমন সময় আর-একটা প্রচণ্ড ঢেউ এল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৌকো উল্‌টে গেল! আমরা কে কোথায় ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে গেলাম জানি না। সাগর আমাদের গ্রাস করলে। আমি সাঁতরাতে ওস্তাদ, কিন্তু তবু ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সাঁতরানো অসম্ভব হয়ে উঠল। সে আমাকে হাবুডুবু খাওয়াতে লাগল, টেনে নিয়ে চলল। আবার খানিকক্ষণ পরে দেখি, ডাঙায় এনে আছড়ে ফেলেছে। তখন তো আমি আধমরা। কিন্তু তা হলে কি হবে, সুযোগ তো ছাড়া যায় না! আবার ঢেউ এসে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে, তার আগেই আমাকে তার নাগালের বাইরে যেতে হবে। উঠে ছুটতে গেলাম, পারলাম না। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।

ঢেউ আবার ধেয়ে এল, আমার উপর দিয়ে চলে গেল, প্রাণপণে সাঁতরাতে লাগলাম। ঢেউ আবার দূরে সরে গেল। আমি এবার বালির উপর দিয়ে কোন রকমে হাঁমাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। ঢেউয়ের নাগালের বাইরে পৌঁছুতে হবে। ঢেউ বার বার এল, কিন্তু

আমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারলে না—আমাকে ছুঁয়ে চলে গেল। অবশেষে পেলাম ডাঙা। সেখানে নরম ঘাস।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। জীবনের আশা ছিল না। জীবন ফিরে পেয়েছি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। তারপর চলতে শুরু করলাম।

না—আমার সঙ্গীদের নামগন্ধ নেই। তা হলে আমিই একমাত্র বেঁচে আছি!

জাহাজখানার দিকে তাকালাম। সমুদ্রে তার চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলাম না।

এবার চারিদিকে তাকাবার ফুরসৎ হল। এ কেমন জায়গা? আমার তো পরনের পোশাক ভিজে, খাবারও সঙ্গে নেই, হাতিয়ারও না। কিছুই নেই—শুধু আছে একখানা ছুরি, একটা তামাক খাবার পাইপ আর খানিকটা তামাক। এই-ই সব।

এদিকে রাত আসছে, কি হবে?

কি আর করি, চলতে লাগলাম।

একটা ছোট্ট নদী পেয়েও গেলাম। জল টলমল করছে। সেখানে আঁজলা ভরে জল খেয়ে পাইপ ধরাতে যাব। কিন্তু চকমকি পাথর তো নেই। তাই খানিকটা তামাক মুখে দিয়ে চিবুতে লাগলাম। খিদে কমে গেল।

এবার কাছের একটা গাছে চড়ে বসলাম। এক ঘুমে রাত কেটে গেল। সকালবেলা নিজেকে বেশ চাঙা মনে হল।

গাছ থেকে নেমে এলাম।

সুন্দর ভোর। আকাশ নীল। সাগর শান্ত।

ভাঙা জাহাজখানাও দেখি পাড়ের কাছে এসে গেছে।

আর আমাদের সেই নৌকোখানাও দেখি বালির উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছে দূরে।

নৌকোখানার কথা না ভেবে ভাঙা জাহাজে যাবার কথা ভাবতে

বসলাম। এরই মধ্যে ভাটার টান শুরু হল। জাহাজের কাছে এগিয়ে গেলাম।

ডাঙা জেগেছে বটে—কিন্তু সাঁতরে যেতে হবে মাইল-খানেক। পোশাক খুলে ফেলে সাঁতরে চললাম। জাহাজের কাছে এসে দেখি জাহাজ অনেক উঁচুতে রয়েছে। সেখানে ওঠাই শক্ত। দু-দুবার এ-ধার ও-ধার সাঁতরে দেখলাম। কিন্তু কিছু ধরে উঠব, এমন কিছু নেই। হতাশ হয়ে পড়ছি, এমন সময় একগাছা দড়ি দেখতে পেলাম। দড়িগাছা নীচে ঝুলে আছে। আমি সেই দড়ি ধরে উঠে এলাম জাহাজে।

ঘুরতে লাগলাম। প্রথমেই গেলাম খাবার দাবার যে ঘরে থাকে সেখানে। পকেট ভরে বিস্কুট নিলাম। তারপর খেতে শুরু করে দিলাম। কি অবাক কাণ্ড—ঐ ঘরে জল ঢোকে নি—বিস্কুটগুলোও মিইয়ে যায় নি। এবার এমন কিছু জিনিসের খোঁজে চললাম যেগুলোর দরকার হতে পারে।

কয়েক টুকরো কাঠ পাওয়া গেল। সেগুলো দড়ি বেঁধে নীচে নামিয়ে দিলাম। আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভেলা তৈরি হল। কতকগুলো বাক্স পড়ে ছিল। সেগুলো ভরে নিলাম রুটি, চাল, পনীর, শুকনো মাংস আর কিছু শস্যের দানায়। ওগুলো মুরগীগুলোর দানা। মুরগী একটাও জ্যান্ত পেলাম না। সব মুরগী মরে খাঁচায় পড়ে আছে। কিছু ওষুধপত্র আর মদও পাওয়া গেল।

এমন সময় জোয়ার এসে গেল। তাকিয়ে দেখি বালির উপর যে পোশাক খুলে রেখে এসেছিলাম, সেগুলো ভেসে যাচ্ছে। আমার পোশাক গেল, তাই জাহাজ থেকে পোশাক যোগাড়ের কথা মনে হল। পোশাকও পাওয়া গেল। কিন্তু বেশি পোশাক-আশাক না নিয়ে, সামান্য ক'টা নিলাম। একটা মিস্ত্রীর হাতিয়ারের বাক্স দেখে সেটা আমার ভেলায় নামিয়ে দিলাম। এবার চাই বন্দুক দু

বন্দুক, দুটো পিস্তল আর দু'পিপে বারুদও মিলে গেল। এই সব নিয়ে তো ভেলায় উঠে বসলাম।

জাহাজ থেকে দাঁড়ও এনেছিলাম। ভেলা ভেসে চলল। কিন্তু ভেলা পাড়ে ভেড়ানোই শক্ত।

তারও উপায় হল। সাগর থেকে ছোট্ট একটা নদী বনের ভিতরে চলে গেছে। ভেলা সেখানে এসে সহজেই ভিড়ল।

মালপত্র পাওয়াও গেছে, নামানোও হয়েছে—কিন্তু রাখব কোথায়?

এটা দেশ না একটা দ্বীপ তাই-ই জানিনে। এখানে মানুষ আছে কি নেই—তাও জানা নেই। এখানে হিংস্র পশু আছে কি না তাই বা কে বলবে।

চারিদিকে তাকিয়ে মাইল-খানেক দূরে একটা ছোট্ট পাহাড় দেখতে পেলাম। জিনিসপত্র রেখে একটা পিস্তল নিয়ে সেই পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে উঠলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, শুধু জল আর জল—আর কিছু নেই। দ্বীপটাকে অনুর্বর বলেই মনে হল। বহু বন-মোরগ দেখলাম, কিন্তু সেগুলো খাওয়া যাবে কি না কে জানে। একটা মস্ত পাখী একটা গাছে বসে ছিল, সেটাকে গুলী করে মারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে বনের এখান-ওখান থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ঝাঁকে ঝাঁকে বন-মোরগ। পাখীটাকে বাজ বলেই মনে হল। বাজের মাংস তো মুখে রোচে না।

যাহোক, পাহাড় থেকে দ্বীপটাকে চেনা গেল। এবার নেমে এলাম। এদিকে রাত এল। কিন্তু ঠাই তো এখনো মেলে নি। তাই বাক্স-পেটরা দিয়ে চারিদিক ঘিরে, কাঠের টুকরো দিয়ে জোড়াও করে একটা কুটীর তৈরি করে সেখানেই শুয়ে পড়লাম।

ভোর হল, জাহাজ থেকে একে একে সব জিনিস আনব এই ঠিক হল।

ভাটা হতেই রওনা হলাম।

আজও আর একটা ভেলা তৈরি হল। আজ নানা মালপত্রে সেটা বোঝাই হল। একখানা গম-পেষা যাঁতাও পাওয়া গেল। আরো গোটা কয়েক বন্দুকও যোগাড় হল। যা পোশাক-আশাক জাহাজে ছিল, সেগুলো নিয়ে নিলাম। তারপর ভেলা ভাসিয়ে চলে এলাম।

ভয় হচ্ছিল, এসে হয়ত দেখব—আমার খাবার সব বুনো জন্তুরা খেয়ে গেছে। কিন্তু এসে দেখি একটা বাক্সের উপরে গম্ভীর হয়ে বসে আছে এক বন-বেড়াল। আমি কাছে এগিয়ে আসতেই সে একটু সরে গিয়ে বসল। মনে হল, আমার সঙ্গে মিতেলি পাতাতে চায়। আমি একখানা বিস্কুট নিয়ে তার দিকে ছুড়ে দিলাম। ও ছুটে বিস্কুটের কাছে গেল, শুঁকল গন্ধ— তারপর খেয়ে ফেললে। তারপর ডেকে উঠল। তার মানে—আরো চাই, কিন্তু আর কোথা থেকে দেব? জন্তুটা বুঝি তাই নিরাশ হয়ে চলে গেল।

জাহাজের পালগুলো এনেছিলাম। সেই পাল খাটিয়ে একটা তাঁবু তৈরি করতে লেগে গেলাম। গাছের ডাল কেটে খোঁটা হল, তার উপরে ছাউনি পড়ল। তাঁবু তৈরি হল—বিজন দ্বীপে ওটা আমার বাড়ি। মালপত্র সেখানে নিয়ে এলাম। চারপাশে খালি বাক্স আর পিপে দিয়ে বেড়া দেওয়া হল। মানুষ আর পশুর ভয় আমার আর নেই। তাঁবুর ঢোকার মুখে ক'খানা তক্তা দিয়ে আটকে দিলাম। তারপর একটা খালি বাক্স এক কোণে এনে সেখানে পাতলাম বিছানা। শিয়রের কাছে রাখলাম পিস্তল, বন্দুক রইল বিছানার পাশে। তার পর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন আবার গেলাম জাহাজে। এবার হাতের কাছে যা পেলাম, তাই নিলাম। তারগুলো কেটে নিলাম, এখান-ওখান থেকে লোহা খসিয়ে নিলাম। একেবারে জাহাজকে জাহাজ লুট যাকে বলে। তারপরে আবার একখানা মস্ত ভেলা তৈরি করে সেগুলো সব নিয়ে এলাম। এমনি করে দিনের পর দিন লুট চলল।

এদিকে তেরো দিন কেটে গেল দ্বীপে। এরই মধ্যে এগারো বার জাহাজে গেছি; যা হাতের কাছে পেয়েছি, এনেছি। একবার পেলাম একটা টানায় খান কয়েক কাঁটা, চামচ আর ছুরি, ক'খানা ক্ষুর। কতটুকু সোনা আর রূপোর টাকাও কতগুলো পাওয়া গেল।

টাকা দেখে হাসি পেল। টাকার দাম কি? এই যে একখানা ছুরি—ওর দাম টাকার চেয়ে এখন ঢের বেশি। টাকা তলিয়ে যাক্ না! আবার কি ভেবে টাকা কয়টা রেখে দিলাম।

এরই মধ্যে আকাশ কালো হয়ে এল। ঝড় উঠবে। তাড়াতাড়ি তাই চলে এলাম। ঝড় উঠল, সারা রাত ধরে চলল। ভোরে উঠে দেখি, জাহাজের চিহ্নমাত্র নেই।

॥ দুই ॥

যেখানে তাঁবু খাটিয়েছিলাম, সেটা পছন্দসই জায়গা নয়—জলা জায়গা। কাছে খাবার জলের নদী বা ফোয়ারা নেই। তাই আমার বাড়ি কোথায় হবে, জায়গা ঠিক করতে বেরিয়ে পড়লাম।

একটা ছোট পাহাড়ের পাশে একটা সমতলভূমি পাওয়া গেল। জায়গাটার খানিকটা ঢালু, সমতলভূমিতে গিয়ে মিশেছে। ঐ ঢালু জায়গাটার সুমুখে তাঁবু খাটাব ঠিক করলাম। ওখান থেকে মাঠের সবুজ ঘাস, গাছপালা দেখতে পাব। ঐ সমতলভূমির পরেই সাগর।

আমি কতগুলো গাছের ডাল কেটে নিয়ে, যেখানে তাঁবু খাটাব, তার চারিদিকে পুঁতে দিলাম। দুটো সারিতে ওগুলো পোঁতা হল। এবার জাহাজ থেকে আনা তার ঐ দু'সারের মাঝখানে টাঙিয়ে দেওয়া হল।

আমার ঢোকার পথ খোলা রইল না। আমি তাঁবুর উপরে উঠে মই দিয়ে ভিতরে নামব—সেই ব্যবস্থা হল। জিনিসপত্র সব নিয়ে আসা হল। বড় তাঁবু তৈরি হতে এবার তার ভিতরে একটি ছোট তাঁবুও তৈরি করে নিলাম। এখানে এনে রাখলাম খাবার আর গুলী-বারুদ। এখানে বৃষ্টি খুব বেশি। বৃষ্টি হলেও এগুলো ভিজবে না।

এবার পাহাড় থেকে পাথর আর মাটি কেটে তাঁবুর তিনদিকে দেয়াল গড়ে ফেললাম। তাঁবুর পেছনে পাথর কাটার ফলে একটি ছোটখাটো গুহাও তৈরি হয়ে গেল, সেখানেও টুকিটাকি জিনিসপত্র রেখে দিলাম। এটি হল রান্নাঘর।

এমন সময় বৃষ্টি এল, বিদ্যুৎ চমকাল, বজ্র হাঁক দিল আকাশে। এবার ভয় হতে লাগল, বারুদে কখন বাজের আগুন ধরে যায়। তাই বারুদ ছোট ছোট পুলিন্দা করে রেখে দিলাম।

এদিকে খাবার তেমন বেশি নেই। কবে একদিন ফুরিয়ে যাবে—তখন কি হবে?

তাই রোজ শিকারে বেরুই। শিকারে গিয়ে টের পেলাম, এ-দ্বীপে বুনো ছাগল আছে। কিন্তু ছাগলগুলো ভারি চালাক, তাদের ধরা শক্ত। বনের মধ্যে ওৎ পেতে ওদের মারা গেল না। ঠিক করলাম, পাহাড় থেকে ওদের উপরে গুলী ছুড়ব। একদিন গুলীতে একটা মাদী ছাগল ঘায়েল হল, সঙ্গে তার ছানা। ছাগলটা পড়ে যেতে, ছানাটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি মাদী ছাগলটাকে কাঁধে করে নিয়ে এলাম। ছানাটাও সঙ্গে সঙ্গে এল। ছাগলছানাটাকে খাওয়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে কিছু খাবে না। শেষে ওকে মেরেই খেতে হল। এই দুটি ছাগলের মাংসে আমার কয়েক দিন বেশ চলে গেল।

সবই হল, কিন্তু মনমরা হয়ে গেলাম। এ কোথায় এলাম? আবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদও দিলাম—তিনি আমাকে এখানে এনে ফেলেছেন বটে, কিন্তু আমাকে সবই জুটিয়ে দিয়েছেন।

কয়েক দিন কাটতেই মনে হল, দিনের হিসেব রাখতে হবে। একখানা বড় কাঠ ক্রুশের মতো করে কেটে পুঁতে দিলাম। তাতে এক-একটি দাগ দিয়ে রাখতে লাগলাম ছুরি দিয়ে। এমন করে আমার ক্যালেণ্ডার তৈরি হল।

জাহাজ থেকে কালি, কলম, কাগজও কিছু এনেছিলাম। তার সঙ্গে খান কয়েক কাঁটা-কম্পাস, চার্ট, খান কয়েক বইও ছিল। আর জাহাজ থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম দুটো বেড়াল। একটা কুকুরও ছিল। সেটাকে আনতে হয় নি, আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। ওদের নিয়ে আমার পরিবার গড়ে উঠল। কিন্তু হায়, ওরা যদি কথা বলতে পারত!

যাহোক এমনি করে বছর ঘুরে এল। ধীরে সুস্থে কাজ করে বাড়ির চারিদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলাম। গাছপালা লাগিয়ে

দিলাম। ঘাস গজিয়ে উঠল। আমার বাড়িটিকে আর বাইরে থেকে দেখা যায় না।

এবার কয়েকটা দরকারী জিনিস তৈরি করতে লেগে গেলাম। একটা চেয়ার আর টেবিল চাই।

কখনো ছেনি বাটালি বা করাতও ধরি নি। কিন্তু একটা আন্দাজ ছিল, তাই কয়েক দিনের চেষ্টায়ই যো-সো চেয়ার আর টেবিল তৈরি হল। একটা তাকও হল, সেটায় থাকবে আমার মিস্ত্রীর সরঞ্জাম।

এইবার চেয়ারে বসে টেবিলের উপরে কাগজ রেখে শুরু হল রোজনামচা লেখা।

একটু শুনবে নাকি লেখাটা ?

সেপ্টেম্বর ৩০শে, ১৬৫৯—অভাগা রবিন্‌সন্ ক্রুশো এখন এই হতাশার দ্বীপে আছে। তার সাথী কেউ নেই।

আমার তো কিছুই নেই। খাবার নেই, ঠাই নেই, পোশাক নেই, হাতিয়ার নেই। সমুখে আমার মরণ।

অক্টোবর—১—২৪ কি ভাগ্য—জাহাজ দূরে দেখা যাচ্ছে। জাহাজে গেলাম বার বার—নিয়ে এসেছি জিনিসপত্তর।

৫ই নভেম্বর—কুকুরটাকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিলাম। একটা বুনো বেড়াল মারলাম। চামড়াটা কাজে লাগল, মাংস বাজে।

২৭শে ডিসেম্বর—একটা বুনো ছাগল মারলাম। ছাগলটাকে নিয়ে এলাম, ছানাটা পেছু পেছু এল। আচ্ছা—ছাগল তো এখানে অনেক—পুষলে কেমন হয় ? দুধ পাওয়া যাবে আর যখন বন্দুকের গুলী ফুরিয়ে যাবে—মেরে খাওয়াও চলবে।

১লা জানুয়ারী—আমার বাড়ির দেয়াল তৈরি করছি।

দেয়াল শেষ। ঘাস গজিয়ে উঠেছে। কেউ দ্বীপে এলেও আমার এ-বাড়ির ঠিকানা পাবে না। যাহোক দেয়াল তো হল—এখন কি কাজ ? কাজের কি অভাব ? আমার চাহিদা যে বেড়ে

যাচ্ছে। জল রাখার পাত্র চাই। দুটো ছোট ছোট পাত্র আছে—কিন্তু বেশি জল রাখি কোথায় ? কোন রকমে কাঠের পাত্র তৈরি হল। এবার চাই আলো।

আঁধার হলেই আমাকে শুয়ে পড়তে হয়। সারা রাত এমনি বিছানায়ই কাটে। হঠাৎ সেই একতাল মোমের কথা মনে পড়ে গেল। মোম আছে, পলতে আছে—আর কি চাই ! অমনি মোমবাতি তৈরি করে ফেললাম। মোমবাতিদান তৈরি হল মাটি দিয়ে। আলো জ্বলে উঠল। আলো হল আমার আঁধার ঘর।

মোমবাতির আলোয় এখন লিখি। কাজ করি। একদিন কি একটা খুঁজতে গিয়ে সেই মোরগের দানার থলেটা পেলাম। থলের মধ্যে শস্য কম—বেশির ভাগই খোসা। থলেটা কাজে লাগবে বলে দেয়ালের ওপাশে ফেলে দিলাম খোসাগুলো।

এরই মধ্যে বর্ষা এসে গেল। ওগুলোর কথা মনে রইল না। মাস খানেক পরে একদিন তাকিয়ে দেখি—কতগুলো শস্যের চারা উঠেছে। ওগুলো যবের গাছ। যবের গাছে ছড়া পাকলে সব তুলে এনে রেখে দিলাম। এই হল আমার চাষের বীজ। এই বীজ থেকে যব হবে, সেই যব দিয়ে গড়ব রুটি। কয়েকটা ধানগাছও দেখলাম। ধানগুলো পাকতে সেগুলো তুলে রাখলাম। আমার ভাতের ব্যবস্থাও ভগবানই করে দিলেন।

এই খেয়ে আছি, এরই মধ্যে এক কাণ্ড !

সেদিন বসে বসে কি কাজ করছিলাম গুহায়। এরই মধ্যে কি যেন হল—মাটি-পাথর খসে পড়তে লাগল। চারিদিক কাঁপছে—দূরে গাছপালা ভাঙছে !

খানিকক্ষণ পরে সব নীরব।

বাইরে এসে দেখি—বিরাট এক ভূমিকম্প হয়ে গেছে। আর সেই ভূমিকম্পে একটা পাহাড়ের চূড়াই ধ্বসে পড়েছে। সাগর তো উত্তাল। হঠাৎ আকাশ ঘন মেঘে ঢেকে গেল, বৃষ্টি আসবে।

হাওয়া ধীরে ধীরে জোরাল হয়ে উঠল। সাগর হয়ে উঠল ফেনিল। তারপর ঢেউ ধেয়ে এল তীরে। দু-একটা গাছ ছিল, উপড়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতর চলে এলাম। ঝড় গোঁ-গোঁ শব্দে ছুটে চলল। তাঁবু বুঝি উড়ে যায়। শেষে গুহায় গিয়ে ঠাঁই নিলাম। কিন্তু সেখানেও ভয়—গুহার পাথর বুঝি মাথায় খসে পড়ে!

বৃষ্টির জলে তাঁবু ভরে গেল। আমার কাজ বাড়ল। আমার দেয়ালের ভিতর দিয়ে নালা কেটে দিলাম। কিন্তু ভূমিকম্পের হাত থেকে কি করে রেহাই পাই?

শেষে ঠিক করলাম, খোলা জায়গায় একখানা কুঁড়েঘর করে রাখব—তার চারিদিকেও এমনি দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেব।

তার পরে সেখানে শুরু হবে কাজ। কিন্তু হাতিয়ারগুলো তো শানিয়ে নিতে হবে। বহু চেষ্টায় একখানা শাণপাথর তৈরি হল। তাতে শাণ দিয়ে নিলাম যন্ত্রগুলো।

এদিকে রুটি ফুরিয়ে এসেছে। খাচ্ছি কম।

ঝড় আর ভূমিকম্পের ক'দিন পরে বাড়ি থেকে বেরুলাম। সাগরের ধারে গিয়ে দেখি, বালির উপর একটা পিপে পড়ে আছে। কয়েকখানা ভাঙা তক্তাও দেখা গেল। এগুলো জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। খানিকদূর যেতেই আমাদের ভাঙা জাহাজখানা দেখা গেল। চড়ার উপর পড়ে আছে।

করাত এনে এবার ভাঙা ডেক, কড়ি-বর্গা—সব কেটে কেটে নিলাম। ওগুলো আমার বাড়ি গড়ার কাজে লাগবে। ক'দিন এই কাজেই কাটল।

সেদিন সাগরের ধারে গেছি। এক বিরাট কচ্ছপ রোদ পোয়াচ্ছে দেখলাম, সেটাকে ধরে নিয়ে এলাম। রাতে কচ্ছপের মাংস রাঁধা হল। খেতে বেশ, ছাগল আর বুনো মোরগের মাংস খেয়ে অরুচি ধরে গিয়েছিল—কচ্ছপের মাংস বেশ ভাল লাগল।

ক'দিন পরে আবার বৃষ্টি নামল। ক'দিন বেরুনো হল না। তার

উপরে কাঁপুনি দিয়ে এল ডেঙ্গুজ্বর। জ্বরের ঘোরে এক স্বপ্ন দেখলাম।

দেয়ালের বাইরে বসে আছি, এমন সময় একটি লোক কালো মেঘ থেকে নেমে এল। বিদ্যুৎ উঠল চমকে। তার ভীষণ চেহারা, সে মাটিতে পা রাখল—কেঁপে উঠল মাটি। সে এল আমার কাছে। তার হাতে এক মস্ত বর্শা। আমাকে খুন করতে ছুটে আসছে। সে এসেই বাজখাঁই স্বরে বললে, তুই আমার কথা শুনিস্ নি—তোকে মরতে হবে।

উদ্যত হল বর্শা—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

জেগে দেখি অন্ধকারে শুয়ে আছি।

তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললাম, ঈশ্বরকে ডাকলাম। ভয় দূরে গেল, মন আবার সজীব হল।

সুস্থ হয়ে উঠতে ক'দিন গেল। এবার আমার দোস্‌রা বাড়ির জায়গা খুঁজতে হবে। নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দ্বীপের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নদী—সেই নদীতে নৌকো ভাসিয়ে দিলাম। কিছুদূর যেতেই বুনো তামাকের গাছ দেখতে পেলাম।

এদিকে রকমারি ফলের গাছও দেখা গেল। তরমুজের তো অভাব নেই। আঙুরও আছে—পেকে টস্‌টস্ করছে। ক'টা আঙুর আর তরমুজ খেয়েও ফেললাম। কিছু নৌকোয়ও তুলে নিলাম।

সেদিন আর বাড়ি ফেরা হল না। একটা গাছে উঠে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

দ্বীপের পশ্চিমে এসেছি। এখানে মিষ্টি জলের ঝরণাও আছে। আছে নারিকেল, কমলালেবু আর লেবু গাছ। লেবুর রস করে খেলাম, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।

কিছু আঙুর পেড়ে এক জায়গায় জমা করে রেখে এলাম। আঙুরগুলো রোদে শুকোলে নিয়ে যাব।

বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিন দুটো থলে নিয়ে গেলাম। গিয়ে

দেখি—আঙুরগুলো ছড়ানো—কোন জন্তু মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এবার আঙুরের গোছা গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলাম। কিছু লেবু, তরমুজ আর কমলালেবু নিয়ে চলে এলাম।

দ্বীপের পশ্চিমভাগেই বাড়ি করব ঠিক করলাম। আমার পুরানো বাড়ি থাকবে। সেখানে গ্রীষ্মে, শীতে, বসন্তে আমি থাকব—লক্ষ্য রাখব, কখন সমুদ্রে সাদা পাল তুলে আসবে জাহাজ—আমাকে মুক্তি দেবে এই হতাশার দ্বীপ থেকে। আর এখানে এসে ঠাই নেব বর্ষাকালে। এখানে খোলা জায়গায় তৈরি করব আমার আবাস।

এই কাজে মেতে উঠলাম। তাঁবু খাটানো হল। দেয়াল গড়ে উঠল। এমন সময় বর্ষা এসে পড়ল। কিন্তু এখানে এক বিপদ—পাহাড় নেই যে ঝড়ো হাওয়া রুখবে, গুহা নেই যে সেখানে গিয়ে ঠাই নেব। তাই বর্ষাও আমার পয়লা বাড়িতেই কাটাতে হল।

যাহোক, বর্ষা কেটে গেল। রোদ ঝলমল করে উঠল। নতুন বাড়ি হল আমার বাগান-বাড়ি। সেখানে এখন আঙুরের গুচ্ছ শুকিয়ে উঠেছে। অনেক কিশমিশই পেলাম।

আমার পরিবারের একটা বেড়াল এর মধ্যে উধাও হয়েছিল। একদিন সে তিনটে ছানা নিয়ে ফিরে এল।

সেপ্টেম্বর এল। আবার ঘুরে এল সেই দিন, যেদিন আমি এখানে এসেছিলাম। তিনশো পয়ষট্টি দিন কেটে গেল। এদিন প্রার্থনা করে কাটালাম।

এদিকে আমার দোয়াতের কালি ফুরিয়ে এল, কাগজও খতম। কিসে লিখব—কি দিয়ে লিখব জানিনে।

এবার বীজ বোনার সময় এল। আমি কাঠের শাবল তৈরি করে নিয়েছি। তাই দিয়ে জমি চাষ হল, বীজ বোনাও সারা, কিন্তু প্রথমে বেশি বুনলাম না। দারুণ খরা চলেছে। বৃষ্টি নেই। শস্যের অঙ্কুর তো দেখা দিল না। বৃষ্টি আসতে ফসলের চারা ফনফনিয়ে বেড়ে উঠল।

বৃষ্টি এখানে ঝুপঝুপিয়ে নামে। শেষ আর হতে চায় না, দিনের পর দিন কেটে যায়। তারপর বহুদিন পরে এক চিলতে সূর্যের আলো দেখা দেয়। তারপরে তো ধোয়ামোছা নীল আকাশ।

বর্ষায় আর আমার বাগান-বাড়িতে যেতে পারি নি। তাই রোদ উঠতেই গেলাম। ঠিক তেমনি আছে। গাছের ডাল চারিদিকে পুঁতে দিয়ে এসেছিলাম, সেগুলো এখন বেড়ে উঠেছে, চারিদিক ঢেকে ফেলেছে।

দ্বীপের পশ্চিমে এসেছি, কিন্তু দ্বীপটা এখনো ঘুরে দেখা হয় নি। তাই একদিন বন্দুক, কিছু খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দ্বীপ মস্ত বড়। চলেছি তো চলেছি—দ্বীপ আর শেষ হয় না। এটা কোন্ দেশ তাও জানিনে। আমেরিকার অংশও হতে পারে, নয় তো স্পেনদেশের উপকূল।

যত এগুচ্ছি, তত সুন্দর হয়ে উঠছে দ্বীপটি। খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে—ঘাসে সবুজ হয়ে আছে। কোথাও বা নাম-না-জানা ফুল ফুটেছে। গন্ধে চারিদিক মাতোয়ারা। কাকাতুয়া ডাকছে গাছের ডালে। আরও কত পাখী।

অনেক কষ্টে একটা কাকাতুয়া ধরলাম। ওকে বুলি শেখাব। ও আমার সঙ্গে কথা কইবে।

চলেছি, কোথাও হলদে রঙের খরগোশ ছুটে পালাচ্ছে—কোথাও বা শেয়াল। কয়েকটা মারলাম, কিন্তু তাদের মাংস তেতো, শক্ত। আমার মাংসের অভাব কি—ছাগল আছে, পায়রা আছে, কচ্ছপ আছে—আর কি চাই?

আশ্চর্য—একটা হিংস্র জানোয়ার দেখছিনে।

একদিন পশ্চিমের সাগরের ধারে এসে পৌঁছলাম। সাগরের ধারে ছোট-বড় কচ্ছপের মেলা বসে গেছে। এখানে বন-মোরগও নানা রকমের। আমার বাড়ির দিকটাই নীরস, এই দিকটাই সরেস।

দেখি—আঙুরগুলো ছড়ানো—কোন জন্তু মাড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এবার আঙুরের গোছা গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলাম। কিছু লেবু, তরমুজ আর কমলালেবু নিয়ে চলে এলাম।

দ্বীপের পশ্চিমভাগেই বাড়ি করব ঠিক করলাম। আমার পুরানো বাড়ি থাকবে। সেখানে গ্রীষ্মে, শীতে, বসন্তে আমি থাকব—লক্ষ্য রাখব, কখন সমুদ্রে সাদা পাল তুলে আসবে জাহাজ—আমাকে মুক্তি দেবে এই হতাশার দ্বীপ থেকে। আর এখানে এসে ঠাই নেব বর্ষাকালে। এখানে খোলা জায়গায় তৈরি করব আমার আবাস।

এই কাজে মেতে উঠলাম। তাঁবু খাটানো হল। দেয়াল গড়ে উঠল। এমন সময় বর্ষা এসে পড়ল। কিন্তু এখানে এক বিপদ—পাহাড় নেই যে ঝড়ো হাওয়া রুখবে, গুহা নেই যে সেখানে গিয়ে ঠাই নেব। তাই বর্ষাও আমার পয়লা বাড়িতেই কাটাতে হল।

যাহোক, বর্ষা কেটে গেল। রোদ ঝলমল করে উঠল। নতুন বাড়ি হল আমার বাগান-বাড়ি। সেখানে এখন আঙুরের গুচ্ছ শুকিয়ে উঠেছে। অনেক কিশমিশই পেলাম।

আমার পরিবারের একটা বেড়াল এর মধ্যে উধাও হয়েছিল। একদিন সে তিনটে ছানা নিয়ে ফিরে এল।

সেপ্টেম্বর এল। আবার ঘুরে এল সেই দিন, যেদিন আমি এখানে এসেছিলাম। তিনশো পয়ষট্টি দিন কেটে গেল। এদিন প্রার্থনা করে কাটালাম।

এদিকে আমার দোয়াতের কালি ফুরিয়ে এল, কাগজও খতম। কিসে লিখব—কি দিয়ে লিখব জানিনে।

এবার বীজ বোনার সময় এল। আমি কাঠের শাবল তৈরি করে নিয়েছি। তাই দিয়ে জমি চাষ হল, বীজ বোনাও সারা, কিন্তু প্রথমে বেশি বুনলাম না। দারুণ খরা চলেছে। বৃষ্টি নেই। শস্যের অঙ্কুর তো দেখা দিল না। বৃষ্টি আসতে ফসলের চারা ফনফনিয়ে বেড়ে উঠল।

বৃষ্টি এখানে ঝুপঝুপিয়ে নামে। শেষ আর হতে চায় না, দিনের পর দিন কেটে যায়। তারপর বহুদিন পরে এক চিলতে সূর্যের আলো দেখা দেয়। তারপরে তো ধোয়ামোছা নীল আকাশ।

বর্ষায় আর আমার বাগান-বাড়িতে যেতে পারি নি। তাই রোদ উঠতেই গেলাম। ঠিক তেমনি আছে। গাছের ডাল চারিদিকে পুঁতে দিয়ে এসেছিলাম, সেগুলো এখন বেড়ে উঠেছে, চারিদিক ঢেকে ফেলেছে।

দ্বীপের পশ্চিমে এসেছি, কিন্তু দ্বীপটা এখনো ঘুরে দেখা হয় নি। তাই একদিন বন্দুক, কিছু খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দ্বীপ মস্ত বড়। চলেছি তো চলেছি—দ্বীপ আর শেষ হয় না। এটা কোন্ দেশ তাও জানিনে। আমেরিকার অংশও হতে পারে, নয় তো স্পেনদেশের উপকূল।

যত এগুচ্ছি, তত সুন্দর হয়ে উঠছে দ্বীপটি। খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে—ঘাসে সবুজ হয়ে আছে। কোথাও বা নাম-না-জানা ফুল ফুটেছে। গন্ধে চারিদিক মাতোয়ারা। কাকাতুয়া ডাকছে গাছের ডালে। আরও কত পাখী।

অনেক কষ্টে একটা কাকাতুয়া ধরলাম। ওকে বুলি শেখাব। ও আমার সঙ্গে কথা কইবে।

চলেছি, কোথাও হলদে রঙের খরগোশ ছুটে পালাচ্ছে—কোথাও বা শেয়াল। কয়েকটা মারলাম, কিন্তু তাদের মাংস তেতো, শক্ত। আমার মাংসের অভাব কি—ছাগল আছে, পায়রা আছে, কচ্ছপ আছে—আর কি চাই?

আশ্চর্য—একটা হিংস্র জানোয়ার দেখছিনে।

একদিন পশ্চিমের সাগরের ধারে এসে পৌঁছলাম। সাগরের ধারে ছোট-বড় কচ্ছপের মেলা বসে গেছে। এখানে বন-মোরগও নানা রকমের। আমার বাড়ির দিকটাই নীরস, এই দিকটাই সরেস।

বলতে ভুলে গেছি, এই সময়েই একদিন আমার কুকুর একটা জ্যান্ত ছাগলছানা ধরে ফেলল। সেটাকে পোষ মানাবার জন্য নিয়ে এলাম। বাগান-বাড়িতে ফিরে এসে কয়েকদিন জিরিয়ে নিলাম। আমার কাকাতুয়াটির জন্য খাঁচা তৈরিও হল। তাকে ডাকি—পল—এই পল!

আবার আর এক বছর ঘুরে গেল। তিরিশে সেপ্টেম্বর এল। দু' বছর আমি হতাশার দ্বীপে আছি। এবার তিন বছরে পড়ল। কাজ করে চলেছি। নিজেকে ভাবছি দ্বীপের রাজা। কিন্তু তবু মনমরা হয়ে যাই। দেশের কথা মনে পড়ে। নীল সাগর বয়ে যাচ্ছে—ঐ সাগরের পরপারে আছে আমার দেশ ইংলণ্ড—আমার হাল বন্দর। কিন্তু সেখানে কি যেতে পারব?

ভাবনার সময় তো নেই। নভেম্বর-ডিসেম্বর এসে পড়ল। আমার শস্যের খেতে ধান আর যব কাটার সময় এল। ভালই হয়েছে ফসল। কিন্তু ভয় আছে পাখীর, ভয় আছে পশুর। ওরা কিছু ক্ষতিও করল। আমি এবার বন্দুক নিয়ে পাহারায় বসলাম। যাহোক, ধান আর যব কাটা হল। কাস্তে কোথা পাব? একখানা ছোরা দিয়েই কাজ সারতে হল। লতা দিয়ে ঝোড়া তৈরি করেছিলাম, সেই ঝোড়ায় রাখলাম শস্য।

অনেক বীজ পেয়েছি—চাই অনেক বড় খেত। তাই শাবল তৈরি করতে লেগে গেলাম। বাড়ির সুমুখের জমিতে চাষ করে ছড়িয়ে দিলাম বীজ। খেতের চারিপাশে বেড়া দিয়ে দিলাম।

খরার দিনে কাজ হয়, কিন্তু বর্ষায় বাইরের কাজ মাটি। তাই বসে বসে ঘরের কাজ করি। পলকে কথা শেখাই। পল আমার সেই কাকাতুয়ার নাম। বলি—বল পল—পল। প্রথম প্রথম চুপ করে থাকত, একদিন হঠাৎ বলে উঠল—পল! সেদিন আমার কি আনন্দ! এতদিন পরে শুনলাম—কথা।

কিন্তু কথা শুনেই তো পেট ভরে না। তাই মাটির বাসন-কোসন তৈরি করলাম। সেগুলো দেখে হাসব কি কাঁদব—নিজেই জানি নে। শস্য ভাঙার যাঁতাও তৈরি করে ফেললাম।

যাঁতায় ভাঙা হল শস্য, কিন্তু কি করে রুটি তৈরি করব?

আগুন তো জ্বালিয়ে দিলাম। একটা মাটির পাত্র তার উপরে চাপালাম। তার পর হাত দিয়ে চেপটে-চেপটে রুটি গড়ে সেই পাত্রে রাখলাম। তারপর আর একটি পাত্র চাপা দিয়ে, জ্বলন্ত কয়লাগুলো চারিদিকে দিয়ে দিলাম। এমনি করেই রুটি তৈরি হল।

তৃতীয় বছরও এমনি করে কাজে-কর্মে কেটে গেল। এবার চতুর্থ বছরের শুরু।

আমার অভাব নেই। ভাণ্ডার আমার পূর্ণ। আমার রাজ্য বিস্তৃত। আমিই এ-রাজ্যের রাজা।

কিন্তু তবু তো অভাব বোধ করছি। কালি ফুরিয়ে আসছে দোয়াতের। যেটুকু আছে, জল ঢেলে ঢেলে চালাচ্ছি। এখন কাগজে মোছা কালিতে লেখা চলছে। তাও রোজনামচা নয়, শুধু দু-একটা কথা আর তারিখ। ক'দিন পরে তাও থাকবে না। শুধু কালিরই অভাব নয়। পোশাক ছিঁড়ে গেছে। পোশাক না পরলে কি হয়? কিন্তু তবু তো পোশাক চাই। চাই মাথার টুপি। নইলে রোদে বেরুনো চলে না।

এমনি ভাবছি, মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। যে ছাগলগুলো মেরেছি, তাদের চামড়া তো রয়ে গেছে। সেগুলো রোদে শুকিয়ে একেবারে ঘষা চামড়া হয়ে গেছে। তারই একখানা চামড়া দিয়ে একটা টুপি তৈরি করলাম। চমৎকার টুপি হল। দেখতে বিশ্রী, কিন্তু কাজে চমৎকার। তারপরে একটা ছাতাও তৈরি হল। সেও চামড়ার ছাউনি—কিন্তু কাজে লাগল।

এখন টুপি মাথায় দিয়ে, ছাতা নিয়ে রোদে বেরোই, কষ্ট কিছুই হয় না।

॥ তিন ॥

এমনি করেই এগারোটি বছর কেটে গেল।

আমার কুকুরটা বুড়ো হয়ে গেছে। আমার বেড়াল দুটোর এক পাল বাচ্চা হয়েছে। আমার কাকাতুয়া এখন কথা বলতে শিখেছে। সে বলে—আহা, বেচারী রবিন্‌সন্ ক্রুশো! তুমি কোথা গেলে? কোথায় গেছলে?

রোজ আমি যখন ফিরে আসি, অমনি করে সে আমাকে ডাকে। কাছে উড়ে আসে। ঝুঁটি নাড়ে। আদর করে একটু ঠুকরে দেয়।

এক পাল ছাগলও পুষেছি।

বারুদ ফুরিয়ে আসছিল। তাই ছাগল-ধরার ফাঁদ পেতেছিলাম। সেই ফাঁদে একদিন ক'টা বাচ্চা ছাগলছানা আর একটা ধাড়ি ছাগল পড়ল।

ধাড়িটাকে ছেড়ে দিলাম, শুধু বাচ্চা ক'টাকে রাখলাম। ওদের খেতে দিলাম দানা। ওদের জন্য খোয়াড় তৈরি করলাম। দেড় বছর যেতে না যেতেই বারোটি ছাগলে আমার খোয়াড় ভরে উঠল। আরো দু'বছরে হল তেতাল্লিশটি। এর মধ্যে কয়েকটাকে মেরে খেতেও হল। ওদের জন্য ক'টা খোয়াড়ই তৈরি হয়ে গেল।

শুধু মাংস নয়, ছাগলের দুধও পেতে লাগলাম। ঐ থেকে বহু কষ্টে বহু ভুলচুক করে মাখন আর পনীর তৈরি করলাম।

কিন্তু বেড়ালগুলো বড় জ্বালাতে শুরু করল। যে বেড়াল দুটো জাহাজ থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তারা কবে মরে গেছে। তাদের বাচ্চা-কাচ্চায় এখন দল ভারী। ওরা পায়ে পায়ে ঘোরে, খাবার চুরি করে খায়। শেষে ওদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে অনেকগুলোকে মেরেই ফেললাম। বাকিগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

সবই তো হল, কিন্তু মানুষের মুখ দেখা তো ভুলে গেছি। আহা একটা যদি মানুষ পেতাম!

জানি—আমাকে দেখে মানুষ ভয় পাবে। কারণ, আমার বেশভূষা অদ্ভুত। মাথায় আমার ছাগলের চামড়ার টুপি। গায়ে ঐ চামড়ারই কোর্তা—তার পরে ব্রীচেস আছে বটে। পায়ে মোজা আর জুতো নেই। কোমরে ছাগলের চামড়ার বেল্ট, তাতে ঝুলছে তলোয়ার আর ছোরা—একখানা ছোট করাতও। আর কাঁধে বন্দুক। তার সঙ্গে বারুদের ব্যাগ। পকেটে পিস্তল। এমন বেশ দেখলে—সবাই তো ভড়কে যাবে।

যদি এই বেশে ইংলণ্ডে যাই—কেউ চিনতে পারবে না! বলবে—এ কে এল? কোন্ এক অসভ্য!

আমি হেসে বলব—আমি রবিন্‌সন্ ক্রুশো।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই চমকে উঠবে; বলবে—ওমা—এমন পোশাক—আবার এমন দাড়ি কোথা থেকে এল?

হাঁ, বলতে ভুলে গেছি—দাড়ি আমি রেখেছি। তবে কোমর অবধি নামে নি দাড়ি। মাঝে মাঝে কাঁচি দিয়ে ছাঁটি, বেশ চাপদাড়ি হয়েছে।

ওসব কথা থাক, খেত-খামারের কথা বলি। বাগান-বাড়ির কথা বলি।

বাগান-বাড়িটি চমৎকার হয়েছে। সেখানে আমি তরমুজ, আঙুর সব সঞ্চয় করে রাখি। আর আমার খেতেও এখন যথেষ্ট ফসল হয়। আমার খোয়াড় ছাগলে ভরতি। অভাব তবু লেগে আছে—এ অভাব, সে অভাব। সবচেয়ে বড় অভাব—সঙ্গী নেই।

সঙ্গী আছে কুকুর, সঙ্গী কাকাতুয়া—সঙ্গী নেই মানুষ।

মানুষ কোথায় পাব?

মানুষের মুখ কি আর দেখব?

॥ চার ॥

সেদিন সাগরের দিকে চলেছি।

দুপুরবেলা। ঝাঁঝাঁ রোদ, যেন রোদেভরা রাত নেমে এসেছে, এমনি নিঝুম চারিদিক। একটা গাছের পাতাও নড়ে না।

চলেছি ছাতা মাথায় দিয়ে, অদ্ভুত পোশাক পরনে।

হঠাৎ ভিজে বালির উপর নজর পড়ল।

এ কি!

এ যে মানুষের পায়ের দাগ। খালি পায়ের দাগ।

বালির উপরে যেন স্পষ্ট ছাপ।

বাজপড়া মানুষের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম।

চারিদিকে তাকালাম, কান পেতে রইলাম।

না, কোথাও কেউ নেই।

ধূ-ধূ করছে বালুবেলা।

কানে বাজছে সমুদ্রের অস্ফুট গর্জন।

তবে ?

তবে এ-পায়ের দাগ কোথা থেকে এল ?

আমার পায়ের দাগ তো নয়। এ যে বেশ বড়সড়ো ছাপ।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম, না—আর পায়ের ছাপ নেই। শুধু ঐ একখানা।

যাহোক, আর দেরী করলাম না। আমার বাড়ি ফিরে চললাম।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—ঝোপঝাড় থেকে এই বুঝি বেরিয়ে এল কোন নরখাদক মানুষ।

না—কেউ এল না।

তেমনি নিঝুম দুপুর। তেমনি সমুদ্রের গর্জন।

দুপুর কেটে গেল, বিকেল গড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যে হল, রাত এল।

কিন্তু ঘুম নেই চোখে। ভাবছি—কি দেখলাম। কত উদ্ভট কল্পনা করতে লাগলাম।

শেষে মনে হল, আমারই পায়ের দাগ হয়ত দেখেছি। এত ঘাবড়ে গিয়াছিলাম যে, সেইটেই বড় বলে মনে হয়েছে।

তাই পরদিন আবার বেরিয়ে পড়লাম। বন্দুক আর পিস্তল, ছোরা আর তলোয়ার শুধু সঙ্গে রইল।

কিন্তু তবু এদিক-ওদিক তাকাই। ঝোপঝাড় দেখে দেখে চলি।

সমুদ্রের ধারে এসে গেলাম। সেই ছাপ তেমনি রয়ে গেছে। মেপে দেখলাম, আমার পায়ের ছাপের চেয়ে ঢের বড়। যেটুকু সাহস ছিল উপে গেল।

তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম বাড়ি। ভেবে ভেবে রাত কাটল।

মানুষ এসেছে দ্বীপে—সেই মানুষ হয়ত এখানে এসে হাজির হবে। কি হবে আমার ?

মানুষ তো মিতে হয়ে আসবে না, আসবে দুশমন হয়ে। আমি তৈরি হতে লাগলাম দুশমনের জন্য।

জাহাজ থেকে কয়টা বড় বন্দুক এনেছিলাম। সেগুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল। সেগুলো দেয়ালের এখানে ওখানে তোপের মতো লাগিয়ে দিলাম। ওখান থেকে ওদের দাগা যাবে।

এবার দেয়ালের বাইরে বেশ খানিকটা জায়গা গাছের ডাল পুঁতে ঘিরে দিলাম। বন তৈরি হয়ে গেল। সে বন ভেদ করে কেউ আসবে না।

জাহাজ থেকে যে সিন্দুক এনেছিলাম, তার ভিতরে ছিল দূরবীন। সেটি নিয়ে সব সময়েই ঘুরি—দেখি।

একদিন হঠাৎ দূরবীনে ভেসে উঠল একখানা নৌকোর ছায়া। নৌকোখানা সাগরে ভাসছে। তারপরে আর দেখতে পেলাম না।

তা হলে মানুষ আছে এ দ্বীপে—তারা হয়ত নরখাদক।

তার প্রমাণও পেয়ে গেলাম।

একদিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি, সেখানে মানুষের মাথার খুলি আর হাড় পড়ে আছে। অদূরে এক আগুনের কুণ্ড দেখতে পেলাম। সেখানে নরখাদকরা এদের পুড়িয়ে খেয়েছে।

এ কি বর্বরতা!

রাগে ফুঁসে উঠলাম। বমি এল। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম।

এখন থেকে তৈরি হয়ে রইলাম ওদের জন্য।

ওদের যদি আমার নাগালে পাই, কুকুরের মতো গুলী করে মারব।

আর ওরা যেসব হতভাগ্যকে পুড়িয়ে খাবার জন্য নিয়ে আসে তাদের ওদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। হাঁ, এই আমার পণ।

কিন্তু কি করে?

ভাবলাম, ওরা যেখানে মানুষ পুড়িয়ে খায়—সেখানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমার তিন-তিনটে বন্দুক দিয়ে ওদের সাবড়ে দেব।

দরকার হয় তো ঝাঁপিয়ে পড়ব ওদের উপর। ওরা দশটা-বিশটা হোক, ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এমনি স্বপ্ন দেখে ক' সপ্তাহ কেটে গেল।

কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে দুরবীন কষে দেখি—না—সমুদ্রে কোন নৌকো আর ভেসে আসে না। সমুদ্রের ধারের বালির উপরে আর দেখা যায় না নরখাদকদের মেলা।

আমার নৌকোখানা সরিয়ে পুব দিকে একটা জায়গায় এনে রেখে দিলাম। তাছাড়া এখন বেরুই কম।

কে জানে—কখন আসবে বিপদ।

॥ পাঁচ ॥

তেইশ বছর কেটে গেল দ্বীপে—দীর্ঘ তেইশটি বছর।

ডিসেম্বর মাস।

এই সময় খেতে আমায় কাজ করতে হবে। তাই বেরুতে হচ্ছে।

ভোরে বেরুই, আর ফিরি দুপুরে। আবার বিকেলে বেরুই।

সেদিন খুব ভোরে বেরিয়েছি।

হঠাৎ দেখি—সমুদ্রের ধারে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলে উঠছে। হাওয়া বইছে—দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন।

তাড়াতাড়ি দূরবীনটা লাগিয়ে নিলাম চোখে।

হাঁ, আগুনের কুণ্ডের পাশে ক'টা মানুষ।

আর এক পাও এগুতে সাহস হল না।

ভয় হল, ওরা হয়ত ঘুরতে ঘুরতে আমার শস্যের খেত দেখতে পাবে। তারপর সব শস্য নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবে।

এখন তো ফসল কাটার সময়।

তারপর হয়ত আমাকেও খুঁজে বের করবে।

কি হবে তখন?

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলাম।

আমার তোপগুলোতে বারুদ ঠেসে দিলাম।

পিস্তল আর বন্দুকে গুলী ভরে নিলাম।

শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করব।

তারপরে এসে পাহাড়ের উপরে উঠলাম। দূরবীন লাগিয়ে নিলাম চোখে।

দেখলাম ন'টা ন্যাংটা মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা বোধ হয় [illegible] পুড়িয়ে নিচ্ছে, তারপর বসবে ভোজে।

ওরা দুখানা ডোঙা নৌকো এনেছে। সেগুলো চড়ার উপর টেনে এনে রেখেছে।

জোয়ার এলে ওরা ঐ নৌকো চড়ে চলে যাবে।

সত্যই জোয়ার এল সাগরে। ওরা নৌকোয় উঠে চলে গেল।

ওরা চলে যেতেই দুটো বন্দুক নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। সাগরের দিকে গিয়ে দেখলাম—রক্ত, হাড় সব পড়ে আছে। মনে রাগ হল। এই বর্বরদের শাস্তি আমি দিতে চাই। কিন্তু তারা তো এখন বহু দূরে চলে গেছে।

তারপর বহুদিন কেটে গেল। আর তাদের দেখা নেই। কিন্তু আমি তৈরি হয়েই রইলাম।

এরই মধ্যে আবার একদিন ঝড় এল। বিদ্যুৎ চমকাল, বাজ হাঁকল। সারাদিন ধরে চলল বৃষ্টি।

হঠাৎ তোপের শব্দ ভেসে এল কানে। কান খাড়া করে রইলাম।

আবার শব্দ।

তাড়াতাড়ি মই বেয়ে উঠে এলাম পাহাড়ের উপরে। অমনি আর একটা শব্দ ভেসে এল।

হয়ত কোন জাহাজ ঝড়ের ভিতর পড়েছে। সেখান থেকেই আসছে সংকেত-ধ্বনি। তারা অন্য জাহাজের কাছে চাইছে সাহায্য।

আমি ওদের সাহায্য করতে পারব না। কিন্তু ওরা তো আমাকে সাহায্য করতে পারে।

কাঠ-কুটরো এনে পাহাড়ের চূড়ায় জ্বালিয়ে দিলাম আগুন, দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

জাহাজ থেকে বোধ হয় দেখতে পেল আগুন। ওরা আবার তোপ দাগল।

তারপরে পর পর কয়েকটা তোপের গর্জন ভেসে এল।

পরদিন ভোর না হতেই ছুটে গেলাম সাগরের দিকে।

তখনো মেঘ কাটে নি। দূরে আবছা দেখা গেল জাহাজের পাল, কিন্তু সে তো বহুদূরে।

বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম। জাহাজ নড়ছে না। বোধ হয় নোঙর করে আছে।

দ্বীপের দক্ষিণ দিকে ছুটে গেলাম।

এরই মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, একখানা ভাঙা জাহাজ।

কিন্তু মানুষগুলো গেল কোথায়?

হয়ত ভেসে গেছে। নয় তো অন্য কোন জাহাজ এসে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে তাদের।

তবু মনে আশা, আহা—যদি একজনও এই দ্বীপে আসে। সাথী পাব—কথা বলার মানুষ পাব।

কিন্তু মানুষ তো এল না।

যাহোক, ঐ ভাঙা জাহাজ থেকে কিছু মালপত্র পেলে মন্দ হয় না।

তাই জাহাজের উদ্দেশ্যে নৌকোয় রওনা হলাম।

জাহাজে ঢুকেই প্রথমে রান্নাঘরে গেলাম। সেখানে দুটো লোক জলে ডুবে মরে আছে।

জাহাজের এখানে-ওখানে শুধু মড়া মানুষ। তারা ঝড়ে পড়ে কেউ পালাতে পারে নি। পাহাড়-সমান ঢেউ এসে তাদের ডুবিয়ে মেরেছে। জিনিসপত্রও সব জলে জলময়। কয়েকটা বাক্স পেলাম। দুটো কোন রকমে নৌকোয় এনে ফেললাম।

কয়েকটা বড় বন্দুকও পাওয়া গেল, সঙ্গে কিছু বারুদ। বন্দুক নিলাম না, বারুদ নিয়ে নিলাম। কয়েকখানা গাঁইতি আর শাবলও যোগাড় হল। সেগুলো নিয়ে চলে এলাম।

বাক্স খুলে পেলাম অনেক পোশাক-আশাক আর কিছু টাকা। টাকাগুলো গুহায় গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রাখলাম।

আবার তেমনি দিন কাটতে লাগল।

আরো দু'বছর কেটে গেল দ্বীপে।

॥ ছয় ॥

মানুষ চাই—কথা কওয়ার মানুষ চাই—সাথী চাই।

শুধু ভাবি সেই কথা।

স্বপ্ন দেখলাম।

নরখাদকেরা এসেছে, আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়েছে। কয়েকটা হতভাগ্য থরথর করে কাঁপছে ভয়ে। এখুনি ওদের কেটেকুটে তারা আগুনে ঝলসে খাবে।

এমন সময় এক হতভাগ্য হঠাৎ দিলে ছুট। আমার এই বাড়িতে এসে পড়ল।

তার পর ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম থেকে জেগে উঠে ভাবলাম, এমনটি হলে বেশ হয়।

স্বপ্ন কি সত্য হয়?

কে জানে।

সেদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই দূরবীন নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে এলাম। এই তো আমার রোজকার কাজ।

চেয়ে দেখি—সমুদ্রের ধারে আবার সেই নরখাদক মানুষের দল এসেছে। এবার দল ভারী—তিরিশজন হবে। তুটো মানুষ পড়ে আছে বালির উপর। তাদের হাত-পা বাঁধা। তারাই হতভাগ্য শিকার। এ কি কাণ্ড!

একটা বন্দীকে ওরা টেনে তুললে। মাথায় মারলে লাঠি। বন্দী পড়ে গেল।

ওরা আবার ছোরা বের করে তাকে কাটতে বসে গেল। আর একটা বন্দীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। সে অবাক হয়ে দেখছে। এখনি ওরও ঐ দশা হবে।

হঠাৎ এ কি হল?

ও বুঝি ফিরে পেয়েছে চেতনা। জীবন বাঁচাবার ইচ্ছা হয়েছে? ও হঠাৎ ছুটতে শুরু করে দিলে। মরিয়া হয়ে ছুটছে। আর ছুটে আসছে আমারই বাড়ির দিকে।

ভয় পেলাম। আমার বাড়ির দিকেই আসছে। ওর পেছনে নরখাদক মানুষের দল। যেন নেকড়ের পাল তারা।

তবে কি স্বপ্ন সত্য হল?

কিন্তু স্বপ্নে তো দেখি নি, নরখাদকের দল ধেয়ে আসছে।

এখন উপায় কি?

দূরবীনের ভিতর দিয়ে আবার দেখলাম।

না সবাই নয়—ওর পেছনে মাত্র তিনজন।

অমনি ভয় দূরে গেল।

ওরা এগিয়ে আসছে। সামনে ছুটছে লোকটা—পেছনে ওরা।

আমার বাড়ি আসতে পথে একটা ছোট্ট নদী আছে। সেই নদীর ধারে এসে দাঁড়াল হতভাগ্য মানুষটি।

নদীতে এমনি জল কম, কিন্তু জোয়ারের জলে ভরে যায়। এখন জোয়ার। কিন্তু সে লাফিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে পার হয়ে গেল। তারপর আবার ছুটে চলল। যারা ওকে তাড়া করে এসেছিল, তাদের ভিতরে তুজন সাঁতরাতে জানে। তারা সাঁতরে পার হয়ে গেল। শুধু একজন দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ফিরে চলল। এবার আমার মনে হল, তুজনকে এঁটে ওঠা কিছুই নয়।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে বন্দুক নিয়ে ফিরে এলাম। আবার পাহাড়ের চূড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি। সমুদ্র যেদিকে, সেই দিকে আমার মুখ। তারপরে তর-তর করে নেমে এলাম। এবার এসে দাঁড়ালাম একেবারে পলাতক হতভাগ্য আর পশ্চাৎধাবনকারীদের মাঝখানে।

এই—এই! করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

পলাতক আমার দিকে তাকিয়ে চমকে গেল। সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যারা তাড়া করে এসেছিল—তারাও চমকে দাঁড়িয়েছে। আমার তো অদ্ভুত পোশাক—মুখে আমার হুঙ্কার।

পলাতক বিস্মিত, ভীত।

ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকলাম।

যারা তাড়া করেছিল, তাদের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর বন্দুকের কুঁদোর ঘা মেরে সামনেরটাকে পেড়ে ফেললাম মাটিতে।

গুলী ছুঁড়তে আমি নারাজ। শব্দ শুনে ওরা দলবল নিয়ে ছুটে আসবে। শব্দ না শুনুক ধোঁয়া তো দেখতে পাবে।

অন্য লোকটা ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু সে তো মুহূর্তের জন্য।

দেখি—ও ধনুকে তীর জুড়েছে আমাকে মারবে বলে। আর দেরি না করে গুলী ছুড়লাম। তীর-ধনুক খসে পড়ল, লোকটাও লুটিয়ে পড়ল।

পলাতক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—যেন পায়ে শেকড় গজিয়েছে।

আমি তাকে ডাকলাম—এই কাছে এস!

হাত নেড়ে ইশারাও করলাম।

এবার সে ধীরে ধীরে কাছে এল। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে। বুঝি ঐ দুটো লোকের মতোই তার দশা হয়।

সে এবার হাঁটু গেড়ে আমার সমুখে বসে পড়ল।

তাকে হাত ধরে তুললাম।

কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকি। যে লোকটা অজ্ঞান হয়ে আছে, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

মানুষটি তার দিকে তাকিয়ে কি বললে, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু মানুষের মুখের কথা শুনে আনন্দ হল।

এরই মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছে নরখাদকটা।

মানুষটি আমার তলোয়ারখানা চাইলে। সেখানা তার হাতে দিতেই, সে এক কোপে ওর মুণ্ড উড়িয়ে দিলে।

তলোয়ারখানা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে সে চলে গেল বন্দুকের গুলীতে হত মানুষটির কাছে। অবাক হয়ে দেখছে তাকে, বুঝতে চাইছে কিসে সে মরল। বুলেট যেখানে গর্ত করে রেখে গেছে, বুকের সেখানটায় হাত দিয়ে দেখলে। তারপর ওর তীর-ধনুক তুলে নিয়ে চলে এল।

আমি ইশারায় তাকে আমার সঙ্গে আসতে বললাম।

ও ইশারায় জানালে, ও ওদের বালির ভিতরে কবর দিতে চায়। আমি রাজী হলাম। ও গর্ত খুঁড়ে দুজনকে কবর দিল।

মানুষটিকে বাড়িতে নিয়ে এলাম, খেতে দিলাম রুটি আর শুকনো মাংস। ও গোগ্রাসে খেল। এবার ওকে ইশারায় জানালাম, ও ঘুমিয়ে নিক।

বেশ সুশ্রী লোকটা—শক্তি রাখে। ওর চুল কালো, কপাল চওড়া, চোখ দুটি উজ্জ্বল। রংও একেবারে মিশকালো নয়। জলপাইয়ে যে রং থাকে, এ সেই রং।

ওর কি নাম জানিনে। কিন্তু তাকে তো একটা নাম ধরে ডাকতে হবে।

আজ শুক্রবার। শুক্রবারে ওকে পেলাম। তাই ওর নাম দিলাম—ফ্রাইডে। তার মানে শুক্রবার।

আমার মানুষ জুটল। এবার এই মানুষকে শেখাতে হবে আমার ভাষা।

॥ সাত ॥

ফ্রাইডে! ফ্রাইডে!—ডাকি।

ও সাড়া দেয়।

হাঁ, আর না, এ দুটো কথা রাতেই ওকে শিখিয়ে দিলাম।

ভোর হতে ওকে পোশাক দিতে হল। ও যে একেবারে উদোম ন্যাংটা।

ও পোশাক পেয়ে খুব খুশি।

ও এবার আমাকে কবরের কাছে নিয়ে গেল। ইশারায় জানালে, ঐ মরা দুটোর মাংস সে খাবে।

আমার তো বমি আসে আর কি! ওকে বারণ করলাম। তারপর দু'জনে গিয়ে পাহাড়ে উঠলাম।

দূরবীন কষে দেখলাম—না—ওরা নেই।

তবু একবার সমুদ্রের ধারে গেলাম। সঙ্গে ফ্রাইডে।

গিয়ে দেখলাম—তেমনি আগুনের কুণ্ড, তেমনি হাড় আর মড়ার খুলি আর রক্ত পড়ে আছে।

ফ্রাইডে আমাকে সংকেতে জানালে, ওদের দুটো জাতির মধ্যে লড়াই হয়। ওরা হেরে যায়। ওদের বন্দী করে আনা হয়েছিল। এই দলের ভাগে পড়েছে ওরা পাঁচজন। চারজনকে দিয়ে মহা ভোজ লাগিয়েছে, শুধু ও বেঁচে গেছে।

ফ্রাইডেকে দিয়ে মড়ার খুলি, হাড়গুলো জড়ো করিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলাম। মনে হল, ফ্রাইডে ঐ মাংস পেলে খুশি হয়। ও-ও তো মানুষের মাংসখেকো আদিবাসী।

সব পুড়িয়ে ফিরে এলাম আমার প্রাসাদ-দুর্গে। তোমরা হাসতে পার—কিন্তু এই তো আমার প্রাসাদ-দুর্গ।

ওকে নিয়ে কাজে বেরুনো শুরু হয়ে গেল।

ওকে ছাগলের চামড়ার ফতুয়া আর সূতীর ইজের দিয়েছি। কিন্তু ওর শোয়ার জায়গা তো চাই।

গুহায় যাবার পথে ওর শোয়ার ব্যবস্থা হল।

মাঝখানে একটা দরজা তৈরি করে নিলাম। আর সেই দরজা রাতে বন্ধ করতাম। কি জানি হঠাৎ যদি ফ্রাইডে মানুষের মাংসের লোভে আমার উপর চড়াও হয়।

মইখানাও টেনে ভিতরে রেখে দিতাম।

কিন্তু এসব করার দরকার ছিল না। ফ্রাইডে ছেলের মতো। ছেলের মতো কি, সে আমার ছেলে।

ওকে কাজ শেখাই, কথা শেখাই। ও বেশ চট করে শিখতে পারে। ক'দিনেই অনেকগুলো কথা শিখে নিলে।

কিন্তু এখনো এক ভয়—ওর মানুষের মাংসের লোভ বোধ হয় যায় নি।

আমি ওর জন্য একটা ছাগল মারলাম। ওকে তার মাংস রেঁধে খাওয়ালাম।

বন-মোরগও ওর জন্য মারা হল। রান্না মাংস এমনি করে খাইয়ে খাইয়ে ওর রুচি বদলে দিলাম।

দিনগুলো বেশ ভালই কাটছে। ও এখন শস্য মাড়াইয়ের কাজ শিখেছে। কথাও বেশ শিখে গেছে। সব কথা বুঝতে পারে, বলতেও পারে কিছু কিছু।

কিন্তু দেশের জন্য ওর মন কাঁদে কিনা কে জানে।

একদিন কথায় কথায় শুধালাম—তোমার দেশ হারলে কেন?

হারে নি তো—সে উত্তর দিলে।

তা হলে তোমরা বন্দী হলে কি করে?

আমাদের ক'জনকে হঠাৎ বন্দী করে ফেলে। ওদের আমরা ধরেছি অনেক।

তোমার জাত তোমাদের ছাড়িয়ে নিতে এল না কেন?

আমরা যে ভয় পেয়ে ছুটছিলাম, এমন সময় ওরা ধরে।

ঐ যে যাদের বন্দী করলে, কি করবে তাদের নিয়ে ?

খাবে।

কোথায় ?

কোন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে।

এই দ্বীপেও কি ওরা আসে ?

হাঁ, আসে।

তুমি কখনো এসেছ ?

হাঁ।

বুঝলাম, ওরা ত হতভাগ্য বন্দীদের নিয়ে এসেছে। এখানে মহা ভোজ খেয়েছে। কি আর করব, এই ওদের রীতি। কিন্তু সভ্য মানুষের সংশ্রবে এ রীতি বদলে যায়। আমি বদলে দিয়েছি। নিজের গর্বই হল। যাহোক, ওকে দ্বীপটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। দ্বীপ থেকে কূল কত দূরে, কত মানুষ আছে আশেপাশের দ্বীপগুলোতে।

ও যা জানে বললে। ওর কাছে এই দেশের জাতিগুলোর নাম জানতে চাইলাম। ও একটা নামই জানে। সে নাম ক্যারিবস।

অমনি মানচিত্রের কথা মনে পড়ল—আমেরিকার এক অংশে আছে ক্যারিবেন নদী। অরুণোকো নদী থেকে গায়নায় গিয়ে যেখানে পড়েছে।

সে সাদা মানুষের দেশের কথা জানে কিনা—তাকে শুধালাম। সে দেশ কত দূরে ?

সে বললে, দুখানা ডোঙা জুড়ে মস্ত নৌকো হবে—সেই নৌকোয় যাওয়া যায় সে-দেশে।

বুঝলাম, ও জাহাজের কথা বলছে।

আমার আশা হল, একদিন হয়ত জাহাজ পাব। সেদিন এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

ফ্রাইডেকে শুধালাম, ফ্রাইডে, মুক্তি পাব তো ?

ফ্রাইডে মাথা নেড়ে হাসলে।

ওকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার কথা শেখালাম।

ও বললে, আমার দেবতা আছে। তার নাম বেনামকি, কিন্তু তাকে ও ভাবে চোখ মুদে ডাকা যায় না। পুরুত তার কাছে যায়, তার কাছ থেকে খবর নিয়ে আসে—ভাল না মন্দ হবে।

আমি বললাম—ওসব মিছে কথা ফ্রাইডে। পুরুতরা তোমাদের ঠকায়।

ও তবু মাথা নাড়ে।

কিন্তু শয়তানকে ও চেনে। ভয় করে। বলে, কর্তা, ওকে ঈশ্বর সাবড়ে দেয় না কেন ?

এমনি করেই বছর কেটে গেল। ফ্রাইডেকে পেয়েছি এক বছর। এক বছর ভালই কাটল।

॥ আট ॥

ওকে গল্প বলি। ইংলণ্ডের গল্প।

সেই যে সাগর-ঘেরা ছোট দ্বীপটি। সেই দ্বীপে আছে মস্ত বড় শহর। কত লোকজন। তারা কাজ করে, খায় দায়। তারা জাহাজে চড়ে সাগরের বুকের উপর দিয়ে চলে যায় দূর দেশে। সেখান থেকে কত ঐশ্বর্য আনে।

আমাদের জাহাজের ওলটোনো বোটখানা দেখাই। সেখানা তো ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে।

ও বলে, কর্তা, আমি আমার দেশে এমনি নৌকো দেখেছি।

তা দেখতে পারে। হয়ত জাহাজ ডুবি হয়ে এমনি একখানা নৌকো ভেসে এসেছিল।

অমনি শুধাই, নৌকোর মানুষগুলোর কি হল ?

সে বললে, তারা আমাদের ওখানে রইল।

কৌতূহল বাড়ল ; জিজ্ঞেস করলাম—তারা কি এখনো ওখানে আছে ?

ও মাথা নাড়লে।

কিন্তু আমার বিশ্বাস হল না। ওদের নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলেছে। সেই কথা বললাম।

ও বললে, না গো কর্তা, ভাই—ভায়ের মতো রয়েছে। ওরা মানুষ পেলেই খায় না। লড়াইয়ে যারা আটক হয় তাদেরই খায়।

ওকে নিয়ে একদিন পাহাড়ে উঠলাম। ওর হাতে তুলে দিলাম দূরবীন। ও অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে উঠল—এই তো আমার দেশ !

বললাম, তোমার দেশকে এত ভালবাস ?

হাঁ, বাসি—ও উত্তর দিল।

কিন্তু সেখানে গেলে আবার তুমি মানুষখেকো হবে না ? আবার কি অসভ্য হয়ে উঠবে না ?

না, না, ফ্রাইডে ভাল হয়ে চলবে ; ভাল হতে বলবে সবাইকে।

বললাম, তা হলে তোমাকে ডোঙা তৈরি করে দিই ?

ও বললে, কর্তা, আপনিও যাবেন, নইলে ফ্রাইডে তো যাবে না।

ফ্রাইডেকে নিয়ে পরের দিন দ্বীপের ও-পাশে যেখানে আমার নৌকো থাকে, সেখানে গেলাম।

নৌকো দেখে ও বললে, এর চেয়ে বড় নৌকো চাই আমার দেশে যেতে।

তার পরের দিন ওকে সাগরের ধারের ভাঙা নৌকোখানা দেখালাম। ও বললে, কর্তা, এতে চলবে। খুব চলবে।

কিন্তু এমন নৌকো গড়বার মতো তো সরঞ্জাম আমার নেই। নৌকো তৈরি করব, এই অভিশপ্ত দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব। এই আমার চিন্তা।

ফ্রাইডেকে বললাম, ছাখ ফ্রাইডে, নৌকো তৈরি করব। সেই নৌকো চেপে তুমি চলে যাবে তোমার দেশে।

ওর মুখে বিষাদের ছায়া। ও বললে, কর্তা কেন ফ্রাইডেকে তাড়িয়ে দিতে চান ? তার উপর কি রাগ করেছেন ? আমি কি করেছি ?

হোয়াৎ মি ডান ? এমনি বিদ্‌কুটে ইংরেজী বলে ফ্রাইডে।

বললাম, না, না, রাগি নি।

ও বললে, নো য়্যাংগ্রী ! রাগ করেন নি ? ফ্রাইডে তো আপনাকে ছেড়ে যাবে না।

বললাম, তুমি ছেড়ে গেলেই বা কি করব ? আমাকে তো এখানে পড়ে থাকতে হবে।

তার হাতে ছিল কবচ। সে সেইটে খুলে আমার হাতে দিয়ে বললে, নিন কর্তা, ফ্রাইডেকে এবার মারুন।

কেন মারব কেন ?

তবে চলে যেতে বলছেন কেন ?—এই বলে কেঁদে ফেললে ঝর-ঝর করে।

ওকে যাহোক করে শান্ত করা গেল।

নৌকো তৈরি করতেই হবে। দ্বীপে বড় বড় গাছের অভাব নেই। নৌকো কেন, বড় বড় জাহাজ অবধি তৈরি করা যায়। কিন্তু তেমন কারিগর কই—হাতিয়ার কই ? কারিগরের মধ্যে তো দুই আনাড়ি—আমি আর ফ্রাইডে—আর হাতিয়ারের মধ্যে ঐ ক'খানা ছেনি, বাটালি আর করাত। তা দিয়ে নৌকো তৈরি করাই শক্ত—জাহাজ তো দূরের কথা।

তবু নৌকো তো তৈরি করতে হবে।

যে-সে নৌকো নয়, সমুদ্রে অকূল পাথারে ভাসতে পারবে যে নাও ! দূর দেশে যাবে যে নাও !

আমার চেয়ে গাছ চেনে ভাল ফ্রাইডে।

ও গাছ বেছে নিলে। দু'জনে কেটে ফেললাম গাছ। তার নামও জানি না।

দেবদারুর মতো গাছ হবে—কাঠের তেমনি গন্ধ, তেমনি রং। পাইনও হতে পারে।

ফ্রাইডে গাছটা খোড়ল করে ডোঙা তৈরি করতে চায়। আমি তাকে গাছটা কাটতে বললাম, সে কেটে ফেলল। তক্তা তৈরি হল করাত দিয়ে চিরে। এবার কাঠ জুড়ে জুড়ে নৌকো তৈরি শিখিয়ে দিলাম। আমি নিজেও কি এসব জানি ! একখানা যে-সে নৌকো তৈরি করে হাতেখড়ি হয়েছিল বলেই তা সম্ভব হল।

মাসখানেকের চেষ্টায় একখানা নৌকো তৈরি হল। এবার জলে ভাসাতে হবে। তা নৌকো বেশ বড়ই হয়েছে। বিশ টন মাল নিতে পারবে।

জলে তো নামানো হল নৌকো। এবার ফ্রাইডেকে বললাম, পারবে এ নৌকো বাইতে ?

খু-উ-ব পারব।

সে তখুনি দাঁড় নিয়ে বাইতে শুরু করে আর কি !

আমি বললাম, সবুর সবুর ! আরো কাজ বাকি।

একটা মাস্তুল চাই, চাই পাল—আবার নোঙর করার জন্য নোঙরেরও দরকার।

মাস্তুল তো একটা দেবদারুর চারা দিয়ে তৈরি হল, ফ্রাইডে তাকে কেটে ছুলে দিব্যি এক মাস্তুল তৈরি করে দিল। জাহাজের পুরানো পাল ছিল। সেগুলোর ওপর এতদিন নজর দিই নি। এবার দেখি সব নষ্ট হয়ে গেছে। যাহোক, কোন মতে দুটি ভাল মজবুত টুকরো পাওয়া গেল। পালও মিলল। একটা নোঙরও পাওয়া গেল।

এবার ফ্রাইডেকে সব হাতে ধরে শেখাতে হল—কি করে নৌকো চালাতে হবে।

এমন সময় বর্ষা এল। নৌকোটাকে খালের মধ্যে এনে রেখে দিলাম। আবার যখন আকাশ পরিষ্কার হবে, তখন ভাবব নৌকোর কথা। এখন তো বর্ষা। বসে থাকব আমার বাড়িতে। এটা-ওটা মেরামত করব। শস্য ভাঙবে ফ্রাইডে। আমরা গল্প-গুজব করব। বর্ষা কমে আসবে, আমরা থাকব বসে। তারপর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে—কি হবে তখন ?

না—সে-কথা আগে বলব না।

বর্ষা চলে গেল। রোদ উঠল। এবার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

কিসের তোড়জোড় ?

সমুদ্রযাত্রার।

খাবার চাই। চাই নানা জিনিসপত্র।

সেগুলো তৈরি করতেই মন দিলাম।

বেরুনো আর হয় না। বন-মোরগ কি ছাগল আর ধরা হয় না। বাড়িতে যা আছে তাই-ই খাই।

সেদিন ফ্রাইডেকে ডেকে বললাম, যাও তো, সমুদ্রের ধারে গিয়ে একটা কচ্ছপ ধরে নিয়ে এস। আজ কচ্ছপের মাংস খাব। বালির ভিতরে ডিম যদি পাও তো নিয়ে আসবে।

ফ্রাইডে চলে গেল।

আমি কাজে মন দিলাম।

মিনিট পনেরো পরে সে ছুটতে ছুটতে এল। তার নিঃশ্বাস বুঝি ফুরিয়ে এসেছে, ঘামে সারা গা ভিজে।

সে এসেই বললে, কর্তা, কর্তা! মন্দ খবর কর্তা!

শুধালাম—কি হয়েছে ফ্রাইডে?

ঐ যে ওখানে ডোঙা এয়েছে, দুটো-তিনটে এয়েছে। ওরা আমার খোঁজে এয়েছে কর্তা!

তাকে কত বোঝালাম ওরা তোমার খোঁজ পাবে না।

কিন্তু ও কেবল বলে, পাবে, পাবে—মোকে কাটবে-কুটবে গো—মাংস বানাবে।

বললাম, ভয় কি, আমাদের বন্দুক আছে! ওরা যদি আসে ওদের সঙ্গে লড়ব। তুমি লড়তে পারবে না?

ও বললে, হাঁ, পারব কর্তা—গুলী ছুঁড়ব—কিন্তু ওরা যে অনেকজন।

বললাম, তাতে কি? বন্দুক দিয়ে সব সাবড়ে দেব।

তা হলে লড়ব, সে বললে, মি ফাইৎ-মি ফাইৎ, কিন্তু তখনো ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাশে, ও থরথর করে কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি একটা বোতল বের করলাম। এতে আছে জোরালো আরক। সেই আরক খাইয়ে দিলাম ওকে।

এবার বন্দুকে গুলী ভরে নিলাম—চারটে বড় বন্দুকে গুলী ভরে নিলাম। দুটি পিস্তলেও বুলেট ভরা হল। আমার মস্ত

তলোয়ারখানা নিয়ে এলাম। এনে ঝুলিয়ে নিলাম কোমরের বেল্টে। ফ্রাইডের হাতে দিলাম একখানা কুড়ুল। তারপর দুজনে গিয়ে উঠলাম পাহাড়ের উপরে।

দূরবীন চোখে লাগাতেই দূরের ছায়া কাছে এল। একুশজন আদিবাসী এসেছে, তাদের সঙ্গে তিনজন বন্দী। তিনখানা ডোঙা তীরের উপরে। ভোজের আয়োজন চলছে।

একটু ভাল করে চেয়ে দেখি—সমুদ্রের ধার থেকে সরে এসেছে ওরা নদীর ধারে। এবার ভোজের তোড়জোড় করছে। এখানটা গাছপালায় ঢাকা।

আমি ফ্রাইডেকে বললাম, ফ্রাইডে, ওদের এই ফিস্তিতে বাধা দিতে হবে। ওদের আমরা খুন করব। তুই কি আমার সঙ্গে যাবি?

সে বললে, হাঁ, যাব।

আমি এবার অস্ত্রশস্ত্রগুলো ভাগ করে নিলাম। ফ্রাইডে গুলী ছুড়তে শিখেছে। সে এখন বন্দুক আর পিস্তল দুই-ই চালাতে পারে। তিনটে বন্দুক আর একটা পিস্তল ওকে দিলাম আর তিনটে বন্দুক আর পিস্তল নিলাম আমি। বারুদ-ভরতি একটা থলে ফ্রাইডের কাছে রাখলাম। তারপরে মার্চ করে চললাম।

চলতে চলতে হঠাৎ মনে হল—কেন যাচ্ছি। ওরা তো আমার কোন ক্ষতি করে নি। ঈশ্বর ওদের শাস্তি দেবেন—আমি কে? কিন্তু তবু যাব, ওদের ঐ ভোজ দেখব।

পা টিপে টিপে দুজনে বনের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। প্রায় ওদের কাছে এসে পড়েছি। ওরা আগুনের কুণ্ড জ্বেলেছে, একজন বন্দীকে শলায় ফুঁড়ে তার মাংস ঝলসে নিয়ে খাচ্ছে। আর একজন এখনো পড়ে আছে বালির উপর।

ফ্রাইডে ফিস-ফিস করে বললে, ও তো মোদের জাতভাই নয়, ও যে দাড়িওলা মানুষ—নৌকোয় চেপে আমাদের দেশে এয়েছিল।

আমি তাকিয়ে দেখি—সত্যিই একজন সাদা দাড়িওলা মানুষ হাত-পা বাঁধা পড়ে আছে।

ওরা এখনো দূরে। ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা ঝোপ আছে আর তারপরে একটা উঁচু জায়গা।

আর সময় নেই। ওরা এবার বন্দীকে তুলছে, তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ফেলছে।

ফ্রাইডের কানে কানে বললাম, আমার হুকুম মতো কাজ করবে। আমি যা করি, তাই করবে।

আমি একটা বড় বন্দুক বালিতে রাখলাম। আর একটা তুলে নিশানা করলাম ঐ অসভ্যদের লক্ষ্য করে। ফ্রাইডেও তাই করল।

এবার বলে উঠলাম—ফ্রাইডে, তৈয়ার?

ও বললে, হাঁ হুজুর— তৈয়ার।

গুলী চালাও!

দুজনের বন্দুক একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। ফ্রাইডে আমার চেয়ে ওস্তাদ। সে দুজনকে মারলে, আর তিনটেকে করলে জখম। আর আমি একটাকে সাবাড় করে দিলাম, দুটোকে জখম করা গেল।

ওরা তো ভয়ে অস্থির। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন্‌ দিকে ছুটবে ভেবে উঠতে পারছে না। কোন্‌ দিক থেকে গুলী এল ঠাহর পাচ্ছে না।

হাতের বন্দুক ফেলে এবার আর একটা করে বন্দুক তুলে নিলাম দুজনে। তারপর আবার গুলী চলল। মরল কম, আহত হল বেশি। ওরা চিৎকার করে পাগলের মতো ছুটতে লাগল।

বন্দুকের গুলী শেষ, আর একটা গুলী-ভরতি বন্দুক এবার তুলে নিলাম। ফ্রাইডেকে বললাম, ফ্রাইডে, তুমিও বন্দুক নিয়ে আমার সঙ্গে এস।

সেও বালি থেকে বন্দুক তুলে নিলে। এবার আমরা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলাম।

চিৎকার করছি আর ছুটছি দুজনে। ভীষণ চিৎকার। ওরা আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। তারপর নৌকোর দিকে ছুটতে লাগল।

আমরা ছুটে এলাম বন্দীর কাছে। ফ্রাইডেকে বললাম, তুমি গুলী চালিয়ে যাও!

ও অমনি গুলী চালাতে শুরু করল। ওদের আর নৌকোয় ওঠা হল না। নৌকোর ভিতরে ওরা স্তূপাকারে পড়ে রইল।

ফ্রাইডে গুলী চালাচ্ছে, আমি এদিকে ছুরি দিয়ে বাঁধন কাটছি বন্দীর। বাঁধন কেটে হাত ধরে তুললাম ওকে। পর্তুগীজ ভাষায় শুধালাম, তুমি কে?

ও উত্তর দিলে—ক্রিশ্চিয়ানাস।

বন্দী বড় দুর্বল আর বেশি কিছু বলতে পারল না! আরকের বোতলটা পকেটে করে এনেছিলাম, খানিকটা আরক ওকে খাইয়ে দিলাম। এক টুকরো রুটিও দিলাম।

বন্দী আমাকে ধন্যবাদ জানালে। কিন্তু আমি তাকে বললাম, মশাই, ধন্যবাদের ঢের সময় পাবেন। এখন আসুন তো দেখি—এই দুশমনগুলোকে সাবাড় করি।

বন্দীটি লাতিন আমেরিকায় মানুষ, জাতে স্পেনবাসী। সে পিস্তল আর তলোয়ার হাতে পেয়ে যেন মরিয়া হয়ে ছুটল।

তখনো কয়েকজন আদিবাসী জীবিত। তাদের সঙ্গে লড়াই বেধে গেল। একজন আদিবাসীকে আঘাত করতেই সে আমাদের ক্রিশ্চিয়ানাসের দিকে পাগলের মতো তেড়ে এসে তাকে পেতে ফেলে তার বুকের উপর চেপে বসতে গেল। ক্রিশ্চিয়ানাস আর উপায় না দেখে পিস্তল বের করে গুলী চালিয়ে দিলে। আমি ওর সাহায্যে ছুটে আসার আগেই ব্যাপারটা হয়ে গেল।

ফ্রাইডে তার কুড়ুল নিয়েই লড়াই চালাচ্ছে। যারা জখম হয়ে পড়ে ছিল, তাদের একে একে সে কুড়ুল দিয়ে হত্যা করল।

স্পেনবাসী এবার আমার কাছে বন্দুক চাইল। বন্দুক দিতেই সে অসভ্যদের তাড়া করল। তারা বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। স্পেনবাসী ছুটতে পারে না। তাই তাদের পেছনে ছুটল ফ্রাইডে। একজনকে সে মেরে ফেলল, কিন্তু আর একজন ছুটে গিয়ে ডোঙায় উঠল। ডোঙা ভেসে চলল।

ডোঙায় আরো কয়েকজন আহত মানুষও ছিল। তবু তারা প্রাণপণে বেয়ে চলল। ফ্রাইডে গুলী চালাল, কিন্তু একটা গুলীও তাদের গায়ে লাগল না।

এবার আমার ভয় হল, ওরা হয়ত গিয়ে খবর দেবে। তারপর পঙ্গপালের মতো ছুটে আসবে আদিবাসীরা। তখন আমাদের জীবন বিপন্ন হবে। তাদের দুখানা ডোঙা পড়ে ছিল। আমি একটায় উঠে পড়লাম। উঠেই দেখি—একজন মানুষ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। লতাপাতা দিয়ে বাঁধা লোকটা।

লোকটা আদিবাসী। তাই ফ্রাইডেকে বললাম, ওকে জিজ্ঞেস কর—কি ব্যাপার ?

ফ্রাইডে ওর কাছে এল, ওর মুখের দিকে তাকালে। তারপরে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! এই কাঁদে, এই হাসে—এই নাচে কোঁদে, এই গান গেয়ে ওঠে! পাগল হল নাকি ফ্রাইডে ?

খানিকক্ষণ পরে ও বললে, আমার বাবা—ঐ আমার বাবা!

আর ডোঙায় চড়ে ওদের তাড়া করা হল না। ওরা ওরই মধ্যে মিলিয়ে গেছে।

॥ নয় ॥

বাবা—বাবা!

বাবাকে ফিরে পেয়েছে ফ্রাইডে।

কি খুশি!

বাবাকে সে তোয়াজ করে খাওয়ায়। ওর বাবা সুস্থ হয়ে উঠল। স্পেনবাসীও সুস্থ হল।

আমার দ্বীপে এখন চারজন মানুষ। আমি তো রাজা, আমার তিনজন প্রজা। তারা আমার অনুগত।

ওদের সঙ্গে কথা বলি।

ফ্রাইডের বাবা তো আমার কথা বোঝে না, ফ্রাইডের মারফতে কথা বলে।

বলি, ওরা কি আবার আসবে নাকি ?

সে উত্তর দেয়, আসবে কি কর্তা! ওরা ভয় পেয়ে গেছে—আর এমুখো হবে না।

স্পেনবাসীকে শুধাই—তোমার এ দশা হল কেন ?

ও বলে—তারা জাহাজ ডুবি হয়ে আসে। যে আদিবাসীদের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছিল, তারা বেশ ভাল ব্যবহার করত। তারপর আর এক দলের হাতে পড়ে তাদের এই দশা।

ওকে বললাম, আর যারা এসেছিল, তাদের কি হল ?

তারা এখনও আদিবাসীদের আশ্রয়ে আছে।—সে বললে।

ওদের উদ্ধার করে আনতে হবে।

কিন্তু তার জন্যে চাই তোড়জোড়। বহু সময় যাবে।

নবাগতদের নিয়ে এবার সারা দ্বীপ ঘুরলাম। ঘুরে ঘুরে দেখালাম আমার রাজ্য।

আমার বাড়ি, আমার খেত, আমার বাগান-বাড়ি—সব দেখালাম, ছাগলের খোয়াড়টিও দেখানো হল।

ওরা তো খুশি। আমার সঙ্গে কাজে লেগে গেল। স্পেনবাসী বেতের কাজে ওস্তাদ। চুপড়ির পর চুপড়ি তৈরি করল। ফ্রাইডের বাবা শস্য মাড়াই আর পেষার কাজ নিলে।

ভাণ্ডারভরা খাবার। অভাব কিছুই নেই। চারজন কেন, এখন বিশজনের খাবারেরও ভাবনা নেই। এবার তাই নিশ্চিন্ত হয়ে ফ্রাইডের বাবা আর স্পেনবাসীকে পাঠিয়ে দিলাম। তারা বাকি বন্দীদের খোঁজ করে আসুক।

ওদের সঙ্গে দিলাম রুটি আর শুকনো আঙুর, একটা করে বন্দুক আর কিছু গুলী। বললাম, একটু হিসেব করে খরচ করো। দরকার হলে ছুঁড়বে গুলী, নইলে নয়।

ওরা ডোঙায় চেপে চলে গেল। হাওয়া বইছিল, ওদের নৌকো দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

আট দিন কেটে গেল। এরই মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল।

সেদিন ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ ফ্রাইডে ছুটে এসে বললে, ওরা আসছে—ওরা আসছে!

আমি অমনি জেগে উঠলাম, বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। তারপর ছুটলাম। সঙ্গে নেই আমার বন্দুক।

আমার বাড়ির চারপাশে বন গজিয়েছে। সেই বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম।

সমুদ্রের ধারে সত্যিই একখানা নৌকো পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে এরা এল কেন? দ্বীপের এ-ধারে তো তারা আসবে না।

ফ্রাইডেও আমার সঙ্গে এসেছে। তাকে বললাম, ওরা আমাদের লোক নয়। ওরা মিতা না দুশমন—তাই বা কে জানে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে আমার দূরবীন নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে এলাম। দেখতে লাগলাম।

এ কি—একখানা জাহাজ দেখছি যে! সত্যিই জাহাজ। নোঙর

ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রে। দেখে তো ইংরেজ জাহাজ বলে মনে হয়। নৌকোখানাও ইংলণ্ডে তৈরি নৌকো।

মনে আনন্দ হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার উপেও গেল।

এখানে জাহাজ এল কেন? বিশেষ করে ইংরেজ জাহাজ?

এদিকে তো ইংরেজের ব্যবসায়-বাণিজ্য নেই!

ঝড়ও তো ওঠে নি যে ঝড়ে এখানে এসে হাজির হবে।

ওরা নিশ্চয়ই ভাল মতলব নিয়ে এখানে আসে নি।

ভাবছি, ওরা নিশ্চয়ই দেখতে পায় নি আমাদের এই ছোট্ট নদীটি। ওরা সমুদ্রের ধারে নৌকো ভিড়ালে। আমার বাড়ি থেকে ওরা এখন আধমাইল দূরে। ওরা যে নদীটা খুঁজে পায় নি, ভালই হল। তা হলে একেবারে আমার দোরগোড়ায় এসে হাজির হত। আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে সবকিছু লুঠপাট করে নিত।

ওরা তীরে নামতেই এবার ভাল করে দেখে নিলাম।

হাঁ, ইংরেজই বটে। দু-একজন হল্যাণ্ডের লোকও থাকতে পারে।

এগারোজন মানুষ। তিনজনের হাতে অস্ত্র নেই। তাদের হাত হয়তো বাঁধা। ঐ বন্দী ক'জন বুঝি কি বলছে।

দেখে তো অবাক হয়ে গেলাম।

এর মানে কি?

ফ্রাইডে বললে, কর্তা, দেখুন, সাহেবরাও মানুষখেকো, ওদের কেটে কুটে মাংস খাবে।

বললাম, না, মাংস খাবে না—মারবে।

ঠিক বলছেন তো কর্তা?—ফ্রাইডে শুধালে।

হাঁ, ঠিক—একেবারে ঠিক!

বললাম বটে, কিন্তু সব সময়েই মনে হচ্ছিল—এই বুঝি ঐ হতভাগ্যদের গুলী করে মেরে ফেলে।

একজনকে যেন একখানা ছোরা তুলতেও দেখলাম। মনে হল, এইবার ছোরা হতভাগ্যের বুকে বিঁধবে।

এখন তো ফ্রাইডের বাবা আর স্পেনবাসীটি থাকলে ভাল হত। ওদের উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারতাম।

না, ছোরা বুকে বিঁধল না। ওরা ছোরা দিয়ে বাঁধন কেটে দিলে বন্দীদের। তারপর দ্বীপে ঘুরতে লাগল। বন্দীরা মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু বসে আছে। ওদের দেখে আমার নিজের কথা মনে পড়ল। আমিও তো এমনি হতাশ হয়ে বসেছিলাম সেই প্রথম দিন। বিজন দ্বীপ হতাশা নিয়ে এসেছিল। ওদেরও সেই হতাশা। কিন্তু ওরা তো জানে না, এ দ্বীপে আছেন এক সদাশয় ইংরেজ—ওদের জাতভাই। তিনি ওদের খেতে দেবেন। বুনো ফলমূল খেয়ে ওদের কাটাতে হবে না। তাছাড়া ওরা উদ্ধারও পাবে।

ওরা জোয়ারের সময় এসে নৌকো ভিড়িয়েছিল। তারপরে এখানে-ওখানে ঘুরল, বন্দীদের কি যেন বললে। এমনি করেই সময় কেটে গেল। কখন ভাঁটার টান ধরেছে জলে, জানতেও পারে নি ওরা। নৌকোখানা যেখানে ছিল, সেখানে এখন বালি আর বালি। ওরা নৌকো জলে টেনে নামাবার চেষ্টা করল, কিন্তু জলরেখা দূরে সরে গেছে। আর এখানে চোরাবালিতে আটকে গেছে নৌকো। ওরা আর কি করবে, আবার দ্বীপে ঘোরা শুরু হল। জোয়ার এলে তবে নৌকো ভাসাতে পারবে—তার আগে নয়।

আমি দেখছি, শুনছি ওদের কথা। শুনে ভয় হল, জোয়ার আসতে আবার দশ ঘণ্টা দেরী। তারপর ওরা নৌকো খুলতে পারবে। তার ভিতরে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তখন আঁধারের আড়ালে লুকিয়ে নজর রাখতে হবে ওদের গতিবিধির উপর—ওদের আলাপ শুনতে হবে।

তাই বলে তৈরি হয়েও নিতে হবে। কিসের জন্য তৈরি?

লড়াইয়ের জন্য।

সাবধানের মার নেই।

আমি আর ফ্রাইডে দুজনে ভাগাভাগি করে চারটে বন্দুক নিলাম।

ভীষণ দেখাচ্ছে আমাকে। ছাগলের চামড়ার টুপি মাথায়, গায়ে ঐ চামড়ারই ফতুয়া—কাঁধে আর হাতে বন্দুক। কোমরে দুটো পিস্তল আর লম্বা তলোয়ার। লড়িয়ে বীর বটে। জঙ্গী জোয়ান। একেবারে রূপকথার দস্যু।

কিন্তু আঁধার ঘনিয়ে আসার আগে এমনি চুপ করে বসে থাকতে হবে।

এখন বেলা দুটো হবে। ওরা বনের ভিতরে গিয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ বন্দী তিনজনও গিয়ে শুয়ে পড়েছে গাছের ছায়ায়।

এবার যদি ওদের কাছে যাই—কেমন হয়?

ফ্রাইডেকে বললাম, তুই আয়, চল আমরা ঐ গাছতলার বন্দী তিনজনের কাছে যাই।

আমি বনের আড়ালে আড়ালে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, মশাইরা!

ওরা ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আমাকে দেখে আরো তাজ্জব বনে গেল।

মুখে রা নেই।

ওরা বুঝি এবার দেবে ছুট!

ওদের অভয় দিয়ে বললাম, ভয় পেয়ো না! আমি তোমাদের বন্ধু। তোমাদেরই মতো মানুষ।

ওদের একজন বলে উঠল, তবে কি ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন?

হাঁ, ঈশ্বরই পাঠিয়েছেন। তিনি তো সব সময় বিপন্নকে সাহায্য করেন।

তোমাদের আমি নামতে দেখেছি।

আর একজন বললে, তুমি মানুষ না দেবদূত?

হেসে বললাম, দেবদূত হলে সুন্দর পোশাক থাকত আমার পরনে, এমনি বন্দুকও থাকত না। আমি মানুষ। তোমাদের

মতোই একজন ইংরেজ। আমার সঙ্গে আছে আমার লোক। এখন বল—কি ব্যাপার ?

একজন বললে, সে এক লম্বা ইতিহাস। সে-কথা এখন তো বলা চলবে না। আমাদের ত্নশমন যে রয়ে গেছে। ঐ যে জাহাজ, আমি তার ক্যাপটেন। এরা ত্নজন আমার সহায়। লস্করেরা বিদ্রোহী হয়ে আমাদের বন্দী করে। তারা আমাদের এখানে ফেলে দিয়ে চলে যাবে—এই তাদের মতলব।

ওরা গেল কোথায় ?

ঝোপ দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐখানে ঘুমিয়ে আছে। ওরা তোমাদের দেখতে পেলেই খুন করবে।

শুধালাম—ওদের হাতে বন্দুক আছে ?

ত্নটো আছে।

হেসে বললাম, তা হলে আর ভয় কি ? এখুনি ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের গুলী করতে পারি। তার চেয়ে ওদের বন্দী করা ভাল।

ও বললে, ত্নটো পাজী আছে। ওরাই যত নষ্টের গোড়া। তাদের দয়া না দেখানোই ভাল। ওদের যদি বন্দী করা যায়, তা হলে বাকি সবাই আমার বাধ্য হবে।

সব শুনে বললাম, দেখ—তোমাদের আমি মুক্তি দেব, কিন্তু ত্নটি শর্ত আছে।

ওরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম, আমার প্রথম শর্ত হচ্ছে, এখানে এই দ্বীপে আমার কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে থাকতে হবে। তোমাদের হাতে আমি অস্ত্র দেব—সে অস্ত্র আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না।

দ্বিতীয় শর্ত—যদি জাহাজের দখল পাওয়া যায়, তোমরা আমাকে আর আমার অনুচরকে ইংলণ্ডে বিনে ভাড়ায় নিয়ে যাবে।

ক্যাপটেন রাজী হলেন।

ওদের হাতে দিলাম তিনটে বন্দুক, গুলী-বারুদও দিলাম। এবার

সেনাপতি হিসেবে হুকুম দিলাম, এই ঘুমন্ত অবস্থায়ই ওদের আক্রমণ করতে হবে। যুদ্ধে লাভ নেই।

কিন্তু ক্যাপটেন, ওদের ঐভাবে মারতে চান না। ঐ ত্নটো পাজীকে শুধু তিনি শাস্তি দিতে চান। ঐ ত্নটো পালিয়ে গেলে জাহাজ থেকে দল বল এনে আমাদের কচুকাটা করবে।

আমি ভেবে বললাম, আপনাদের যা ভাল মনে হয় করুন।

এরই মধ্যে ঝোপের মধ্যে ত্নজন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

ক্যাপটেনকে আবার শুধালাম—এরাই কি সর্দার নাকি ?

না।—উনি উত্তর দিলেন।

এবার আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন। সবাই যদি পালিয়ে যায়—আপনারাই দোষে পালাবে।

ক্যাপটেন অনুচর ত্নজনকে নিয়ে ঝোপের মধ্যে চলে গেলেন। ওদের সাড়া পেয়ে আর সবাই জেগে উঠল।

অনুচরেরা অমনি গুলী চালালে—ত্নড়ুম-ত্নড়ুম !

একজন লুটিয়ে পড়ল, আর একজন সাংঘাতিক জখম হল। তবু সে উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে। এবার ওর সঙ্গীদের সাহায্য চাইল।

এরাই ত্নজন দলের সর্দার। আহত লোকটাকে ক্যাপটেন এসে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করলে সে পড়ে গেল, আর উঠল না।

এবার আমিও এসে হাজির।

ওরা সবাই নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইল।

ক্যাপটেন বললেন, আমি জীবন ভিক্ষা দিতে পারি, যদি তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা না কর। তোমাদের কথা দিতে হবে। জাহাজ নিয়ে যেতে হবে জামাইকায়।

ওরা শপথ করলে, মেরীর দিব্যি, মাইরি—আমরা আর গোলমাল করব না।

ক্যাপটেন অমনি গলে গেলেন।

কিন্তু আমি বললাম, ওদের সবাইকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখ। ওরা শত্রু, ওদের আমি বিশ্বাস করিনে।

সকলের হাত-পা বেঁধে ফেলল অনুচরেরা। এবার ক্যাপটেন আর ফ্রাইডেকে বললাম, তোমরা নৌকোটা চড়ায় তুলে রাখ। দাঁড়গুলো নিয়ে এস।

ওরা তাই-ই করল।

এরই মধ্যে আরো তিনজন লস্কর বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

ওদের বেঁধে ফেলা হল। আর বাকি কেউ নেই।

ওরা পড়ে রইল, আমি আর ক্যাপটেন আর তাঁর অনুচর দুজনকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

॥ দশ ॥

খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হল গল্প।

কেমন করে এলেন এ দ্বীপে?—ক্যাপটেন কথায় কথায় শুধালেন।

সব কথাই বললাম, তারপর ঘুরে ঘুরে দেখালাম আমার প্রাসাদ-দুর্গ।

ওকে বললাম, জানেন, আমার বাগান-বাড়িও আছে। আছে আঙুর বাগিচা আর নারকেলকুঞ্জ। আমি তো রাজা। আমি সে-বাড়ি আপনাকে দেখাব। নারকেলকুঞ্জ বাতাসে সর্‌সর্ করে আপনাকে অভ্যর্থনা করবে। লেবু আর ফুলেরা গন্ধ ছড়াবে আপনার পথে। কমলা ফুলের মধু আপনি খাবেন। আমার তো অভাব কিছুই নেই। মানুষ শুধু নেই। কিন্তু কি হবে মানুষ দিয়ে? মানুষ তো অকৃতজ্ঞ। মানুষের বুক যেন পাথর দিয়ে গড়া।

ক্যাপটেন অবাক হয়ে শুনলেন।

তাঁকে বললাম, আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন তো হাতে ঢের কাজ। জাহাজে ক'জন লস্কর আছে?

এখনো ছাব্বিশ জন, ক্যাপটেন উত্তর দিলেন।

এত! তা হলে জাহাজ দখল করব কি করে?

ক্যাপটেনও ভাবছেন। তিনি বললেন, হাঁ, ওরা মরিয়া হয়ে আছে। ওরা জানে—ধরা পড়লে ওদের প্রাণ যাবে। তাই ওরা উন্মাদ। ইংলণ্ডে ফিরলে ফাঁসিকাঠে ওদের প্রাণ দিতে হবে। এই ক'জন মানুষ নিয়ে ওদের আক্রমণ করা চলবে না।

হাঁ, সোজাসুজি আক্রমণ করলে চলবে না বটে! ফাঁদ পাততে হবে ওদের জন্য। কৌশল করতে হবে।

কিন্তু কি কৌশল?

লস্করেরা ফিরছে না দেখে—ওরা তো নৌকো নিয়ে খুঁজতে আসবেই। তারপর আমাদের সাবাড় করে দেবে। তাই কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

কিছু ভেবে পেলাম না। শেষে বললাম, নৌকোখানা থেকে সবকিছু সরিয়ে বালির উপর কাৎ করে রেখে দেওয়া যাক!

ওরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হল।

সমুদ্রের ধারে এসে নৌকো থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে নিলাম, কয়েকটা ব্রাণ্ডির বোতল আর বারুদ পাওয়া গেল। কিছুটা চিনিও মিলল। আহা, বহু বছর চিনির মুখ দেখি নি! একটু মুখে দিলাম। আবার ইংলণ্ডের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল আমার বাড়ির কথা।

তারপরে পাল দাঁড় সব খুলে নিলাম। নৌকোর তলায় মস্ত ফুটো করেও দিলাম।

জাহাজ দখল করব—এমন আশা আমার নেই। আমার ইচ্ছে, ওরা চলে গেলে ঐ নৌকোখানা আবার মেরামত করে নেব। তার পরে আমার স্পেনবাসী বন্ধুর খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়ব।

এমন সময় গুড়ুম করে তোপের আওয়াজ হল।

জাহাজ থেকে নৌকো ফিরে আসার সঙ্কেত দিচ্ছে। নৌকো ঐ সঙ্কেত শুনে ফিরে আসবে।

কিন্তু নৌকো আর ফিরবে না।

ওরা বার বার তোপ দাগতে লাগল।

জলে ভাসল না নৌকো। শুধু সমুদ্র অস্ফুট গর্জন করে তীরে আছড়ে পড়তে লাগল।

না—নৌকো নেই। ভাসছে না নৌকো। সমুদ্রের নীলজলে পড়ল না পালের ছায়া। তালে তালে পড়ল না দাঁড়। নিথর সমুদ্র।

নৌকো লবেজান হয়ে পড়ে আছে বালির উপর।

লস্করেরা বন্দী।

এদিকে সব সঙ্কেত ব্যর্থ, ওরা জাহাজ থেকে আর একখানা নৌকো ভাসিয়ে দিল। নৌকো দাঁড় দিয়ে জল কেটে আসছে তীরের দিকে। জল কাটছে দাঁড়ে, জল ছিটিয়ে পড়ছে।

দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখলাম—দশজন মানুষের কম হবে না। ওদের সঙ্গে আছে বন্দুক।

ওরা এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুখ পর্যন্ত ভেসে উঠেছে। ওরা এবার এসে নৌকো ভেড়াল। এখানেই নৌকোখানা কাৎ করে রেখে এসেছি।

ক্যাপটেন ওদের সবাইকে চেনেন। তিনি বললেন, ওদের মধ্যে তিনটি মানুষ ভারি ভাল। কিন্তু জাহাজের সেকেণ্ড অফিসারটা ভাল নয়, লস্করেরাও বজ্জাত।

তিনি বলে উঠলেন, না, না, মশাই, ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না!

আমি হাসলাম। হেসে বললাম, আমাদের মতো মানুষের ভয় কি? আমরা কি মরণের ভয় করি? তাছাড়া, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন। আমাদের হাতের হাতিয়ার তো চুপ করে বসে থাকবে না। তাছাড়া তিন-চার জন যদি ভাল লোক থেকে থাকে, আমাদের দলে তাদের আসতেই হবে। আসুক ওরা—ওদের আমাদের হাত থেকে রেহাই নেই।

ক্যাপটেন উৎসাহ পেলেন। আমরা এবার লড়াইয়ের তোড়জোড় করতে লাগলাম। বন্দীদের সরিয়ে ফেললাম গুহায়। দু-তিনজন যারা ক্যাপটেনের মতে ভাল—তাদের আমাদের সঙ্গে রাখলাম। কিন্তু সাবধান করে দিলাম, যদি তোমরা পালাবার চেষ্টা কর—গুলী করব!

বন্দীদের গুহার মুখে ফ্রাইডেকে বসিয়ে দিলাম পাহারা।

সং ক'জন লস্করের হাতে বন্দুকও দিলাম. কিন্তু তাদের উপর কড়া নজর রইল। এবার দশজনকে এঁটে ওঠা যাবে—ওদের মধ্যে

তিনজন তো আমাদেরই দলে আসবে। তা হলে রইল সাতজন। তা আমরাও তো সাতজন।

ওরা নৌকো থেকে এসে একে একে নামলে। আগের নৌকোখানার হাল দেখে তো অবাক। পাল নেই, দাঁড় নেই, তলায় মস্ত বড় ফুটো। কে এদশা করল তাই ভাবছে।

এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে।

বিস্ময়ে অবাক। কথা নেই মুখে।

ওরা এবার চেঁচিয়ে সঙ্গীদের ডাকতে শুরু করল—

পল—পল!

রবার্ট—রবার্ট!

এই জো!

কিন্তু সাড়া নেই। চিৎকার ফিরে ফিরে এল—নেই—নেই—কেউ নেই।

প্রতিধ্বনি বলে—নেই—নেই!

নেই রবার্ট!

নেই পল!

নেই জো!

কেউ নেই।

এবার ওরা গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপর গুলী ছুঁড়ল। কিন্তু তবু কোন সাড়াশব্দ নেই।

গুলীর শব্দ নিরালা বনভূমির ভিতরে ভেসে চলে গেল—দূরে বহু দূরে।

গুহায় বন্দী ওদের সঙ্গীরা শুনতে পেল না। কিন্তু যারা বাইরে আছি, সবাই শুনতে পেলাম। কিন্তু লস্করদের সঙ্গীরা চেঁচিয়ে উঠে সাড়া দিলে না। যদি দিত—আমাদের গুলী তাদের স্বর চিৎকারে ভেঙে পড়ার আগেই তাদের নিকেশ করে দিত। না—ওরা নীরব হয়েই রইল।

ওরা বিস্মিত হল। তাই ত—কোথায় গেল সঙ্গীরা? তাদের কি জানোয়ার গিলে ফেলেছে? না—দ্বীপের আদিবাসীদের হাতে ওরা প্রাণ দিয়েছে?

ওরা ভয় পেয়েছে। ফিরেই বুঝি যেতে চায় জাহাজে।

হাঁ, ওরা তো নৌকো চাপল। দাঁড় বেয়ে চলেও গেল।

ক্যাপটেন হতাশ হলেন। জাহাজ দখল করা তো হল না। এই বিজন দ্বীপেই পচে মরতে হবে। দেশে ফেরা তো হবে না।

কিন্তু এ কি! ওরা যে আবার আসছে। এবার দলে ভারী। শুধু মাত্র তিন জনকে রেখে এসেছে পাহারা।

ওরা ওদের ভাই-বেরাদরদের ফেলে যাবে না। আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখবে দ্বীপ।

ক্যাপটেন ভয় পেলেন। আমিও যে ভয় না পেলাম, এমন নয়।

জাহাজখানা একটু দূরে সরে গিয়ে নোঙর করল। ওরা এসে নামল তীরে।

আমাদের বসে দেখা ছাড়া তো উপায় নেই।

ওরা একে একে এসে নামল। দল বেঁধে চলেছে। ওরা ঘুরতে ঘুরতে আমাদের পাহাড়টার দিকেই আসছে।

কাছে এলে গুলী করতে পারি, কিন্তু এখনো ওরা বন্দুকের পাল্লার বাইরে।

ওরা ক্লান্ত হয়ে এবার বসে পড়েছে। ওরা যদি ঘুমিয়ে পড়ে তো ভাল হয়। কিন্তু চোখে ওদের ঘুম নেই। সজাগ ওদের চোখ। ওরা বিপদের ভয় করছে প্রতি মুহূর্তে—অথচ বিপদ তো ওদের অজানা।

ঐ বনের ভিতর থেকে যে-কোনো মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত বিপদ আসতে পারে—আসতে পারে নীল সমুদ্র থেকে—নীল আকাশ থেকেও বুঝি নেমে আসতে পারে বিপদ। তাই ত ওরা অজানা বিপদের আশঙ্কায় অধীর, অস্থির।

ক্যাপটেন একটা প্রস্তাব করলেন, সবাই মিলে আসুন বন্দুক

ছুঁড়ি। ওরাও নিশ্চয়ই পাল্‌টা গুলী ছুঁড়বে। ওদের টোটা বেশি নেই। যখন তা ফুরিয়ে যাবে, আমরা ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। তা হলে বিনা রক্তপাতেই কাজ হাসিল হবে।

বুঝলাম, সঙ্গীরা বিদ্রোহী হলেও ক্যাপটেনের তাদের উপর মায়া আছে। যাহোক, প্রস্তাবটা ভালই লাগল।

কিন্তু তবু মন সায় দেয় না। কি জানি—কি বিপদ ঘটবে!

আমি বললাম, রাত আসুক, যদি ওরা নৌকোয় ফিরে না যায় তখন দেখা যাবে।

বহুক্ষণ কেটে গেল। অস্থির হয়ে উঠেছি আমরা। ওরা এখনো পরামর্শ করছে। এবার ওরা উঠে দাঁড়াল। সমুদ্রের দিকেই চলেছে। বোধ হয় জাহাজেই ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গীদের ফিরে পাবার আর আশা নেই। তাদের ছাড়াই জাহাজ ভাসিয়ে দেবে।

ক্যাপটেন তো অবাক। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন—হায়, হায়, তা হলে সব শেষ!

আমি বললাম, দাঁড়ান, একটা কৌশল করছি।

ফ্রাইডে আর ক্যাপটেনের একজন অনুচরকে তখনি পাঠিয়ে দিলাম নদীর ধারে। ওরা সেখানে বনের আড়ালে থেকে চিৎকার করে উঠল—

আঁ—আঁ—আঁ—আঁ!

অমনি চিৎকার শুনতে পেয়ে লস্করেরা চিৎকার করে উঠল।

ওরা আবার উত্তর দিল।

লস্করেরা নৌকোয় উঠতে গিয়েছিল, কিন্তু এবার ওরা ফিরে দাঁড়াল। ভাবল হারানো সঙ্গীরা ডাকছে।

ওরা অমনি চিৎকার লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। ওরা এসে নদীর পারে দাঁড়াল।

নদী জলে ভরে গেছে। ওরা পার হতে না পেরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

নৌকোখানায় এখন তুজন মানুষ। ওরা দাঁড় বেয়ে নৌকোখানা এনে রাখল নালার ভিতরে।

এদিকে সঙ্গীরা নদীর পাড় ধরে খুঁজতে খুঁজতে চলেছে। আর ফ্রাইডে আর ক্যাপটেনের সাথীটি দূরে বন থেকে চিৎকার করছে।

আমরা এদিকে বেরিয়ে পড়লাম। নদী পার হয়ে যেখানে নৌকোখানা তুজন লস্কর পাহারা দিচ্ছিল, একেবারে সেখানে গিয়ে হাজির। ক্যাপটেন গিয়ে ওদের ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়লেন। ওরা অমনি গড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল নৌকোর ভিতরে।

এদিকে ওদের বনের ভিতরে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে ফ্রাইডে আর অনুচরটি। তারা আর সহজে পথ চিনে ফিরে আসতে পারবে না। সমুদ্রের ধারে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। আমরা অন্ধকারে ওৎ পেতে থাকব ওদের জন্য—তারপর ওদের বন্দী করব।

সন্ধ্যে নামল বনে। বালুবেলায় রক্তসূর্যের শেষ আভা মিলিয়ে গেল। এখন সন্ধ্যের আঁধার। নীল সমুদ্র গর্জাচ্ছে। ফস্‌ফরাস ঝল্‌সে উঠছে।

ফ্রাইডে অনুচরটিকে নিয়ে ফিরে এল। এদিকে ওরাও নৌকোর কাছে এসে গেছে। ওরা এসে দেখে, খালের মুখে নৌকো। পাহারাদার তুজন নেই। ওরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। স্পষ্ট শুনলাম, ওরা বলাবলি করছে—

এ কি যাতুর দ্বীপ ভাই?

সঙ্গীরা লোপাট, নাওখানাও লোপাট!

এখানে দৈত্য-দানা আছে নাকি?

আর একজন বললে, নিশ্চয়ই এখানে মানুষ আছে, এ ওদের কাজ! তারা ওদের সবাইকে খুন করেছে, আমাদেরও করবে।

না, না, আর একজন বললে—এ শয়তানের দ্বীপ। শয়তানে পেয়েছে আমাদের।

ওরা আবার চিৎকার করে ডাকল—

ও পল !

ও রবার্ট !

ওহে জো—কোথায় গেলে ?

কোন সাড়া এল না।

ওরা কি আর করবে, নিরুপায় হয়ে হাত মোচড়াতে লাগল।

আমার লোকেরা অস্থির, অধীর—তারা চায় এই অন্ধকারে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আমি আর ক্যাপটেন তো রক্তপাত চাইনে। যদি লড়াই হয় তো ও-পক্ষের কিছু মরবে, আমাদের পক্ষেরও ক্ষতি হতে পারে। ওদের হাতেও আছে বন্দুক। আমি শুধু লক্ষ্য করছি, ওরা কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই ওদের কাছে একটা ঝোপের আড়ালে বসে রইলাম। ফ্রাইডে আর ক্যাপটেনকে হুকুম দিলাম, তারা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাক ওদের কাছে। তারপরে সুযোগ বুঝে গুলী চালাতে হয় চালাবে।

ওরা আমার হুকুম তামিল করল।

জাহাজের বিদ্রোহীদের সর্দার দুটি মারা গেলেও এখনও সেকেণ্ড অফিসারটি আছে। এটিও কম নয়। কিন্তু সে ভারি মুষড়ে পড়েছে। ক্যাপটেন চান ওকে সাবাড় করে দিতে। ওর কাছে এসেই তিনি গুলী করে বসলেন। অভ্রান্ত লক্ষ্য। গুলী গিয়ে বিঁধল বুকে। সেকেণ্ড অফিসার পড়ে গেল। তার পাশের লোকটি আর এক গুলীতে খতম। তারপর আরো দুটি।

একজন পালিয়ে গেল।

এদিকে গুলীর শব্দ শুনে আমরাও এগিয়ে এলাম। আমার পল্টন তো কম নয়। আমি জাঁদরেল জেনারেল, ফ্রাইডে আমার সহকারী। আছেন ক্যাপটেন আর তাঁর সঙ্গীরা। তিনজন আছে যুদ্ধবন্দী।

আমরা সংখ্যায় ক'জন অন্ধকারে ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

নৌকোয় যে দু'জনকে বন্দী করে রেখেছি, তারা ওদের নাম ধরে চেঁচাতে লাগল—

পল—পল !

রবার্ট—রবার্ট !

জো ! তোমরা শোন ! তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

কেউ সাড়া দিল না। সবাই চুপচাপ।

ওদের মধ্যে একজনের নাম টম স্মিথ। এবার তার নাম ধরে ডাকা হল।

টম সাড়া দিলে, বললে—কে রবিন্‌সন্ নাকি।

হাঁ, আমি রবিন্‌সন্। তোমরা হাতিয়ার ফেলে দাও! আত্মসমর্পণ কর। নইলে তোমরা সবাই মরবে।

কার কাছে আত্মসমর্পণ করব—তারা কোথায় ?—টম শুধাল।

রবিন্‌সন্ বলল, আমাদের ক্যাপটেনের কাছে। তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশজন অস্ত্রধারী মানুষ। সেকেণ্ড অফিসার মরেছে।

তোমাদের সর্দার দু'জনের একজন আহত, আর-একজন মারা গেছে। আমি বন্দী। আরো ক'জন বন্দী হয়ে আছে। যদি তোমরা আত্মসমর্পণ না কর—সবাই মরবে।

খানিকক্ষণ সব নীরব। ওরা চাপা স্বরে পরামর্শ করছে। এবার টম স্মিথের স্বর ভেসে এল, আমরা আত্মসমর্পণ করতে রাজী। আমাদের কোন ক্ষতি হবে না ?

ক্যাপটেন আঁধারের ভিতর থেকে বললেন, আমি তোমাদের ক্যাপটেন। আমি বলছি—ক্ষতি হবে না।

অমনি আঁধারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল টম স্মিথ আর উইল অ্যাটকিন্স। উইল জাহাজের মেট, ক্যাপটেনের হাত-পা সে-ই বেঁধেছিল।

ক্যাপটেন তাদের আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি দ্বীপের কর্তা—গভর্ণর—এঁর পায়ে হাতিয়ার রেখে সেলাম কর।

ওরা তাই করল। সবাই একে একে ধরা দিল। ওদের হাত-পা বাঁধা হল।

এদিকের কাজ তো শেষ—কিন্তু এখনো আর-এক কাজ বাকি। জাহাজ দখল করতে হবে। ঐটেই তো আসল।

ক্যাপটেন এবার বন্দীদের বুঝিয়ে দিলেন, ওরা মহা অন্যায় করেছে।

ওরা সবাই অনুতপ্ত। সবাই প্রাণ বাঁচাতে চায়।

ক্যাপটেন জানালেন, তোমরা আমার বন্দী নও। এই দ্বীপের শাসনকর্তা একজন ইংরেজ। তোমরা তাঁরই বন্দী। তিনি তোমাদের ইচ্ছে করলে বাঁচাতে পারেন। তিনি অভয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের ইংলণ্ডে পাঠানো হবে। সেখানে তোমাদের বিচার হবে। কিন্তু অ্যাটকিন্সকে মরতে হবে। ভোর-বেলাই হবে তার ফাঁসি।

ক্যাপটেনের এসব মিছে কথা। কিন্তু তবু কাজ হল। অ্যাটকিন্স তাঁর পায়ে পড়ে বললে, দোহাই ক্যাপটেন, আমাকে বাঁচান।

সবাই তখন ক্যাপটেনের পায়ে পড়ছে আর বলছে, ক্যাপটেন, দোহাই আপনার—আমাদের ইংলণ্ডে চালান দেবেন না। সেখানকার আদালত বড় কড়া, আমাদের ফাঁসিতে লটকে দেবে।

আমি অন্ধকারেই আছি। ওরা তো দ্বীপের শাসককে দেখতে পাচ্ছে না। আমি ক্যাপটেনকে ডাকলাম। আমার স্বর ভেসে আসতেই সবাই চুপ।

ক্যাপটেনকে কে যেন বলে উঠল, ঐ তো উনি ডাকছেন।

ক্যাপটেন অমনি বললেন, কর্তা, আমি আসছি।

এতে ওরা আরো অবাক হয়ে গেল, ওরা ভাবল, পঞ্চাশজন অনুচর নিয়ে গভর্নর কাছেই আছেন।

ক্যাপটেন ঝোপের কাছে এসে দাঁড়ালেন, আমি তাঁকে চুপি চুপি জাহাজ দখলের কথা বললাম।

তিনি বললেন, কাল ভোরেই সে কাজ সারতে হবে।

এবার বন্দীদের নিয়ে কি করা যায়?

বন্দীদের মধ্যে অ্যাটকিন্স আর বিদ্রোহী ক'জনকে হাত-পা বেঁধে গুহায় ফেলে রাখা ঠিক হল। সেখানে আরো ক'জন আছে।

ওদের ফ্রাইডে আর ক্যাপটেনের দু'জন অনুচর নিয়ে চলে গেল। অন্যদের আমার গাছপালা-ঘেরা বাগানে ফেলে রাখা হল। সেখানে হাত-পা বাঁধা হয়ে ওরা থাকবে। ওদের খাবার ব্যবস্থাও করা হল।

সারারাত আমরা সজাগ রইলাম। গুহার মুখে পাহারা রইল ক্যাপটেনের অনুচর আর ফ্রাইডে। আর আমরা পালা করে পাহারা দিতে লাগলাম। এমনি করেই রাত কেটে গেল।

॥ এগারো ॥

ভোর হয়ে আসছে। ভোরের হাওয়া দিচ্ছে।

ক্যাপটেনকে বললাম, এই তো সময়।

ক্যাপটেন অমনি খোলা জায়গায় এসে বন্দীদের কাছে হাজির হলেন। ওদের বললেন, আমি জাহাজ দখল করব। আমার যথেষ্ট লোকজন আছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও ক'জনকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। বাকি সব এখানে বন্দী থাকবে।

ওরা রাজী হয়ে গেল। ক্যাপটেন ওদের মধ্য থেকে বেছে পাঁচজনকে সঙ্গে নিলেন।

আমাদের সেনাবাহিনী সাজল। ক্যাপটেন, তাঁর দু'জন অনুচর, প্রথম দলের দুজন বন্দী—ক্যাপটেনের কথায় যাদের মুক্তি দিয়েছি—দিয়েছি হাতিয়ার। দু'জন শেষের দলের বন্দী। তাছাড়া আরো পাঁচজন। সবশুদ্ধ বারোজন।

গুহায় আছে পাঁচজন বন্দী। তারা এদের প্রতিভূ হয়ে রইল।

ক্যাপটেনকে বললাম, এদের নিয়ে আপনি যান। আমি আর ফ্রাইডে থাকব। বন্দীদের উপর নজর রাখব আমরা।

ফুটো নৌকোখানা মেরামত করে নেওয়া হয়েছে। আর একখানা নৌকোও পাওয়া গেছে। ক্যাপটেন অনুচরদের নিয়ে একখানায় চড়ে বসলেন। তাঁর সঙ্গে জাহাজের মেট ছাড়া আরো পাঁচজন মানুষ। আর একখানায় অন্য একজন অনুচর আর চার জনকে নিয়ে উঠল।

ওরা দুপুর রাতে গেল জাহাজের কাছে। ক্যাপটেন জাহাজের কাছে গিয়েই রবিন্‌সন্‌কে বললেন—এবার তুমি জাহাজের ওদের ডেকে বল, নৌকো ফিরেছে। খুঁজে আনতে দেরী হয়ে গেছে।

রবিন্‌সন্ ডাকলে, জাহাজে যে তিনটি লস্কর পাহারা ছিল তারা ছুটে এল।

এদিকে ক্যাপটেন আর মেট জাহাজে উঠে পেছন থেকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দু'জনকে ঘায়েল করলেন। আর একটিকেও কায়দায় আনা গেল।

এরই মধ্যে অন্য নৌকোখানাও পৌঁছে গেছে।

জাহাজের নয়া ক্যাপটেন তখনো তার কেবিনে ঘুমোচ্ছিল। তার দুজন সহকারীও ছিল সেখানে। তারা সোরগোলে জেগে উঠল। তারা ভয় পেয়ে দরজা বন্ধ করে আছে।

একজন লস্কর একটা শাবল নিয়ে এল। সেই শাবলের আঘাতে দরজা ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে যারা ছিল, তারা গুলী চালাল। এদিকে এরাও গুলী চালাল। ক্যাপটেন নিজে ঐ নয়া ক্যাপটেনকে পিস্তলের গুলীতে পেড়ে ফেললেন। জাহাজ এবার পুরোপুরি দখলে এল।

ক্যাপটেন হুকুম দিলেন—সাতবার তোপ দাগা হোক।

আমাকে তোপ দেগে জানাবার কথা ছিল। তোপের শব্দ শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। তারপরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। তখনো পাহারা দিচ্ছে ফ্রাইডে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ বন্দুকের শব্দে জেগে উঠলাম।

কে যেন ডাকছে—গভর্ণর—গভর্ণর—কর্তা—কর্তা।

এ তো ক্যাপটেনের স্বর।

তাড়াতাড়ি উঠে এলাম পাহাড়ের উপরে। দেখি ক্যাপটেন দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। জাহাজখানা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ঐ যে আপনার জাহাজ! ঐ জাহাজ আর আমরা তো আপনারই।

জাহাজখানার দিকে তাকিয়ে দেখি, নদীর মুখে নোঙর করা হয়েছে। আমার জাহাজ আমার বাড়ির দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

তা হলে এই দ্বীপ থেকে মুক্তির দিন এল! জাহাজ তৈরি।

কথা বলতে পারছিনে। উত্তেজনায় কাঁপছি।

ক্যাপটেন বুঝতে পেরে তাঁর পকেট থেকে বোতল বের করে আমাকে একটু ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলেন। আমি মাটিতে বসে পড়লাম।

সুস্থ হয়ে উঠে ক্যাপটেনকে জড়িয়ে ধরে বললাম, বন্ধু, আপনি দেবতার দূত হয়ে এসেছেন! আপনিই আমার মুক্তির উপায় করে দিলেন!

আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ দিলাম। তিনিই তো বিজন দ্বীপে আমাকে এই দীর্ঘ বছরগুলো বাঁচিয়ে রেখেছেন। আজ তিনিই আমার মুক্তি দিলেন।

ক্যাপটেন এবার বললেন, আমার সবই আপনার। আপনার জন্য জাহাজ থেকে কিছু উপহার এনেছি।—এই বলে তিনি হাততালি দিলেন।

একজন লস্কর নিয়ে এল বাক্স। বাক্স খোলা হতে—তার ভিতরে ব্র্যাণ্ডির বোতল, কিছু বিস্কুট দেখা গেল। চিনিও এক বোয়েম আছে, এক থলে ভরতি লেবু, ছটা শার্ট, ছ'জোড়া দস্তানা, স্যুট আছে, ক'জোড়া জুতো।

আবার আমি সভ্য মানুষ হব। ছাগলের চামড়ার টুপি আর কোর্তা ছেড়ে পাকা সাহেব বনে যাব।

উপহার তো পাওয়া গেল, এবার বসলাম বৈঠকে।

ঐ যে যারা গুহায় বন্দী হয়ে আছে, ওদের নিয়ে কি করা যায়?

ওদের মধ্যে দু'জন একেবারেই বেয়াড়া। তাদের নিয়ে যাওয়া চলবে না। তারা আবার ঘোঁট পাকাবে। এক শেকলে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে প্রথম যে ইংরেজ উপনিবেশ পাব, সেখানে পুলিসের হাতে দেওয়া চলে।

আমি বললাম, ওদের এই দ্বীপে রেখে গেলে কেমন হয়?

ক্যাপটেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, চমৎকার হয়!

ফ্রাইডেকে দিয়ে বন্দীদের গুহা থেকে আনালাম। ওরা সংখ্যায় পাঁচজন। আমি এর মধ্যে পোশাক পরে নিয়েছি। এখন তো আমাকে লাটসাহেব বলেই মনে হচ্ছে। দ্বীপের লাটসাহেব—শাসনকর্তা—গভর্ণর।

ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমাদের কুকীর্তির কথা সব শুনেছি।

তোমাদের নয়া ক্যাপটেন বন্দী। তাকে ফাঁসিতে লটকানো হবে।

এবার তোমাদের কি বলবার আছে বল।

ওদের মধ্যে একজন বলল, আমাদের কিছু বলবার নেই হুজুর। আপনার আর ক্যাপটেনের দয়ার উপর নির্ভর করে আছি।

বললাম, ক্যাপটেন তোমাদের ইংলণ্ডে নিয়ে যেতে চান না। আর নিয়ে গেলেও বন্দী হয়ে তোমাদের যেতে হবে। সেখানে আদালতে বিচারে তোমাদের ফাঁসিই হবে। তোমরা ইচ্ছে করলে এই দ্বীপে থাকতে পার।

ওরা অমনি রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু ক্যাপটেনের তাতেও অমত। তিনি ওদের ফাঁসি লটকাতেই চান, শেষে অনেক বুঝিয়ে তাঁকে রাজী করানো গেল।

ক্যাপটেনকে এবার বললাম, তিনি জাহাজে গিয়ে যাত্রার তোড়জোড় করুন। কাল ভোরে নৌকো পাঠাবেন, আমি এর মধ্যে সব গুছিয়ে নেব।

বন্দীদের ডেকে বললাম, কাল ভোরে আমি চলে যাচ্ছি। তোমরা এই দ্বীপে থাকবে। এখানে খাদ্যের অভাব নেই। আমার শস্যের খেত আছে, আঙুর-বাগিচা আছে, ছাগলের খোঁয়াড় আছে। যা দরকার, সবই আছে। আর ষোলজন স্পেনবাসীও এখানে আসবে। ওদের জন্য চিঠি রেখে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে ভালভাবে মিলে-মিশে তোমরা থাকবে।

ওদের আমার বন্দুক আর পিস্তলগুলোও দিয়ে দিলাম।

সব গোছানো শেষ—সব কাজ শেষ।

সকালবেলা নৌকো এল জাহাজ থেকে। ক্যাপটেন এলেন সঙ্গে।

আমরা নৌকোয় চেপে বসলাম।

ছাগলের চামড়ার টুপি আর ছাতা নিয়ে এসেছি। আর এনেছি আমার কাকাতুয়া পলকে। টাকাকড়িও গুহা থেকে তুলে এনেছি। ওগুলো এতদিন অকেজো হয়ে ছিল, এবার কাজে লাগবে।

আজ আটাশ বছর পরে দ্বীপ ছেড়ে চলেছি। এই আমার দ্বীপ—আমার রাজ্য। এই দ্বীপ আমার মা। আমাকে রক্ষা করেছে। আমাকে দিয়েছে এক প্রকৃতির রাজ্য। এর কথা তো ভুলতে পারব না। দুপুর রাতে আমার হাল বন্দরের বাড়িতে যখন ঘুম ভেঙে যাবে, যখন জাহাজের সিটি বেজে উঠবে, তখন তো শুনতে পাব এই দ্বীপের স্বর। নারিকেল পাতার মর্মর, লেবুর ফুলের গন্ধ নিয়ে আসবে। দ্বীপ-মা আমার বিদায়!

ঐ তো এখনো চোখের মণিতে ভাসছে তোমার ছায়া। তোমার গাছের শর্‌শর্ শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। তোমার নারিকেল বন আমাকে বিদায় দিচ্ছে। বিদায়—মা আমার বিদায়! আবার কবে তোমার এখানে ফিরব কে জানে! তোমার ছায়া তো এখনো নীল সমুদ্রের বুকে ঝলসে উঠছে। বিদায়!

॥ বারো ॥

তারপর?

তারপর জাহাজ নির্বিঘ্নে এসে পৌঁছুলো ইংলণ্ডে।

এ ইংলণ্ড যে চিনতে পারিনে।

আমার ফ্রাইডে তো অবাক বনে গেছে। আমিও কম অবাক হইনি।

পুরানো মুখ আর দেখা যায় না। সব নতুন মুখ।

ইয়র্কসায়ারে আমার বাড়িতে এলাম।

বাড়িখানাও যেন বদলে গেছে।

দরজায় কড়া নাড়লাম।

বাবা ছুটে এলেন না, মাও না।

দরজা খুলে গেল। একটি ছোট্ট মেয়ে এল।

তাকে বললাম, কে আছে বাড়িতে?

মা আছেন।

তাঁকে খবর দাও।

আমার বোন এল।

হাঁ, আমার বোন। সেও বদলে গেছে। অনেক ঠাহর করে চিনতে হয়। চিনলাম। সেও চিনতে পারে না—অবাক হয়ে চেয়ে আছে।

বললাম, আমি রবিন্‌সন্ ক্রুশো। আমি রব-রব-রবিন!

ও তো আরো অবাক বনে গেল।

পঁয়ত্রিশ বছর পরে ফিরে এসেছে ক্রুশো।

তুমি রবিন! রব! বোন আমাকে জড়িয়ে ধরল।

বোনের কাছে সব কথাই শুনলাম।

বোন বলল, বাবা-মা মারা গেছেন। আমি মৃত জেনে আমার জন্য উইলে তাঁরা কিছু রেখে যান নি। এ বাড়ি আমার নয়।

বললাম, চাইনে বাড়ির ভাগ, চাইনে টাকাকড়ি! আমি চাই শান্তি।

কিন্তু কোথায় পাব শান্তি? দেশে তো শান্তি নেই। দু' দিনেই হাঁফিয়ে উঠলাম।

ফ্রাইডেকে বললাম, চল্ ফ্রাইডে, আবার ভেসে পড়ি জাহাজে।

ফ্রাইডে মনমরা। সে বলে, চলুন কর্তা, চলে যাই সেই দ্বীপে।

বলি—দ্বীপ কি ভাল লাগবে?

সে উত্তর দেয় মাথা নেড়ে—হাঁ, ভাল লাগবে।

আমাকেও ডাকে সাগর। নীল সাগর হাতছানি দেয়। ফিস্ ফিস করে সে বলে—

বেরিয়ে পড় বন্ধু! বেরিয়ে পড়! আমি তোমাকে নিয়ে যাব যেখানে লবঙ্গ-বন, যেখানে নারিকেল-কুঞ্জ মর্মরধ্বনি তোলে বাতাসে, যেখানে আছে পদে পদে রোমাঞ্চ, আছে অ্যাডভেঞ্চার! কি হবে এখানে থেকে?

মন সায় দেয়। আবার দেয়ও না। আপন মনে বলি, অ্যাডভেঞ্চার তো যথেষ্ট হয়েছে। বিশ বছর মানুষের মুখ দেখি নি। শুধু শুনেছি সমুদ্রের গর্জন, গাছের ফিসফিসানি।

আবার ভাবি—ইংলণ্ডের জন্য দ্বীপে মন কাঁদত। কিন্তু এখানে আমার কে আছে!

সেই ফ্রাইডে, সেই পল! পথে যাদের দেখি, তারা আমার হলেও আমার তো নয়।

আয়নার সুমুখে ছাগলের চামড়ার টুপিটা পরে দাঁড়াই। মনে হয়, ঐ টুপি যখন মাথায় ছিল, কি সুখী ছিলাম! আজ তো সে সুখ নেই।

ফ্রাইডেকে বলি—আবার যাবি ফ্রাইডে?

ফ্রাইডে হাসে আর বলে, আমি রাজী। আমি রেডী।

বলি, রেডী হয়ে থাক্! আবার আমরা যাব।

তারপরে একদিন আবার ভেসে পড়ি।

এবার যাব ঈস্ট ইণ্ডিজে। সঙ্গে একদল ব্যবসায়ী।

পথে আমার সেই বিজন দ্বীপ।

ক্যাপটেনকে আগে থেকেই বলা ছিল, দ্বীপে এসে নামলাম।

স্পেনবাসীরা ফিরে এসেছে। ওরা আমাকে আর ফ্রাইডেকে আদর করে নিয়ে গেল।

দ্বীপে সেই জাহাজী লস্করেরাও আছে। আর কয়েকটি মেয়েও দেখলাম। পাশের দ্বীপের মেয়ে। তারা এ-দ্বীপের মানুষদের বিয়ে করেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা খেলছে। তাদের হাসিতে আর কলরবে মুখর হয়ে উঠেছে দ্বীপ।

এই তো আমি চাই।

দ্বীপ ভরে উঠুক মানুষে। বিজন দ্বীপে লোকালয় গড়ে উঠুক! এইখানে হয়ত আমার চিরদিনের জন্য থাকা হবে না, কিন্তু মাঝে মাঝে আসব, থাকব।

তাই ওদের বললাম, আমি আবার আসব এ-দ্বীপে। আমাকে তোমরা একটু ঠাঁই দেবে তো?

ওরা হেসে বলল, এতো আপনারই দ্বীপ।

না, না, আমার একার নয়—আমাদের সকলের, এই বলে চলে এলাম।

তারপর?

তারপর আমার কথাটি ফুরালো।